KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009.

Card No. KLMLGK [illegible]	Place of Publication 25/2 মোহনবাগান রো, কলিকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher সৌরীন্দ্রনাথ দাস
Title শনিবারের চিঠি	Size 4.5"X7" 11.43 X 17.78 c.m.
Vol. & Number ১৮/১০ ১৮/১১ ১৮/১২	Year of Publication : শ্রাবণ, ১৩৫৩ ভাদ্র, ১৩৫৩ আশ্বিন, ১৩৫৩
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : সজনীকান্ত দাস	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

রবিবারের চিঠি

শ্রাবণ ১৩৫৩ : মূল্য ছয় আ
JULY 1946 : Price 6 A

সম্পাদক :
শ্রীসজনীকান্ত দাস

স্নানযাত্রা

কি ধর্মানুষ্ঠান, কি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও আমোদ-প্রমোদ—স্নান আমাদের সমাজ-জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই একটি অঙ্গবিশেষ। কাজেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবনযাত্রাকে বিরাট একটি স্নানযাত্রার সঙ্গে তুলনা করলে অত্যুক্তি

করা হবে না। দৈনন্দিন জীবনেও স্নানের আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে 'রেণু' সাবান মেখে স্নান করে দেখবেন। 'রেণু'-র সুগন্ধি ফেনরাশি শরীর স্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করে স্নানের প্রকৃত প্রশান্তি ফুটিয়ে তোলে মনে। এত গুণের তুলনায় দামেও 'রেণু' সুলভ।

সোল সেলিং এজেন্টস :
হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল কর্পোরেশন লিঃ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সূচী

শ্রাবণ ১৩৫৩

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা
—শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায় ... ২৩৯
শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী ... ২৪৮
পদচিহ্ন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৪৯
রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল ... ২৫৭
মহাসুবির জাতক—"মহাসুবির" ... ২৫৯
বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট—শ্রীবিরূপাক্ষ ... ২৭৫
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৭৯
কাব্য ও অলঙ্কার—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ... ২৮৯
মানুষের প্রকৃতি ও শান্তি
—শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র ... ২৯৮
অসহায় ... ৩০২
সংবাদ-সাহিত্য ... ৩০৩

শনিবারের চিঠি'র অগ্রিম চাঁদার হার

বার্ষিক ৪৸০ ও ষাণ্মাসিক ২৷৵০ ; প্রথম সংখ্যা ভি.পি.তে পাঠাইয়া চাঁদা আদায় করিতে হইলে—যথাক্রমে ৪৸৵০ ও ২৷৵০ ; প্রতি সংখ্যা রেজিস্টার্ড বুক-পোস্টে পাঠাইতে হইলে—যথাক্রমে ৭৲ ও ৩৷৷০। প্রতি সংখ্যা ডাকে ।৵১০ ; ভি. পি.তে ৷৷৵০। বর্ষ আরম্ভ কার্তিক হইতে ; গ্রাহক যে কোন মাসে হওয়া যায়।

NIP—DT(7)B

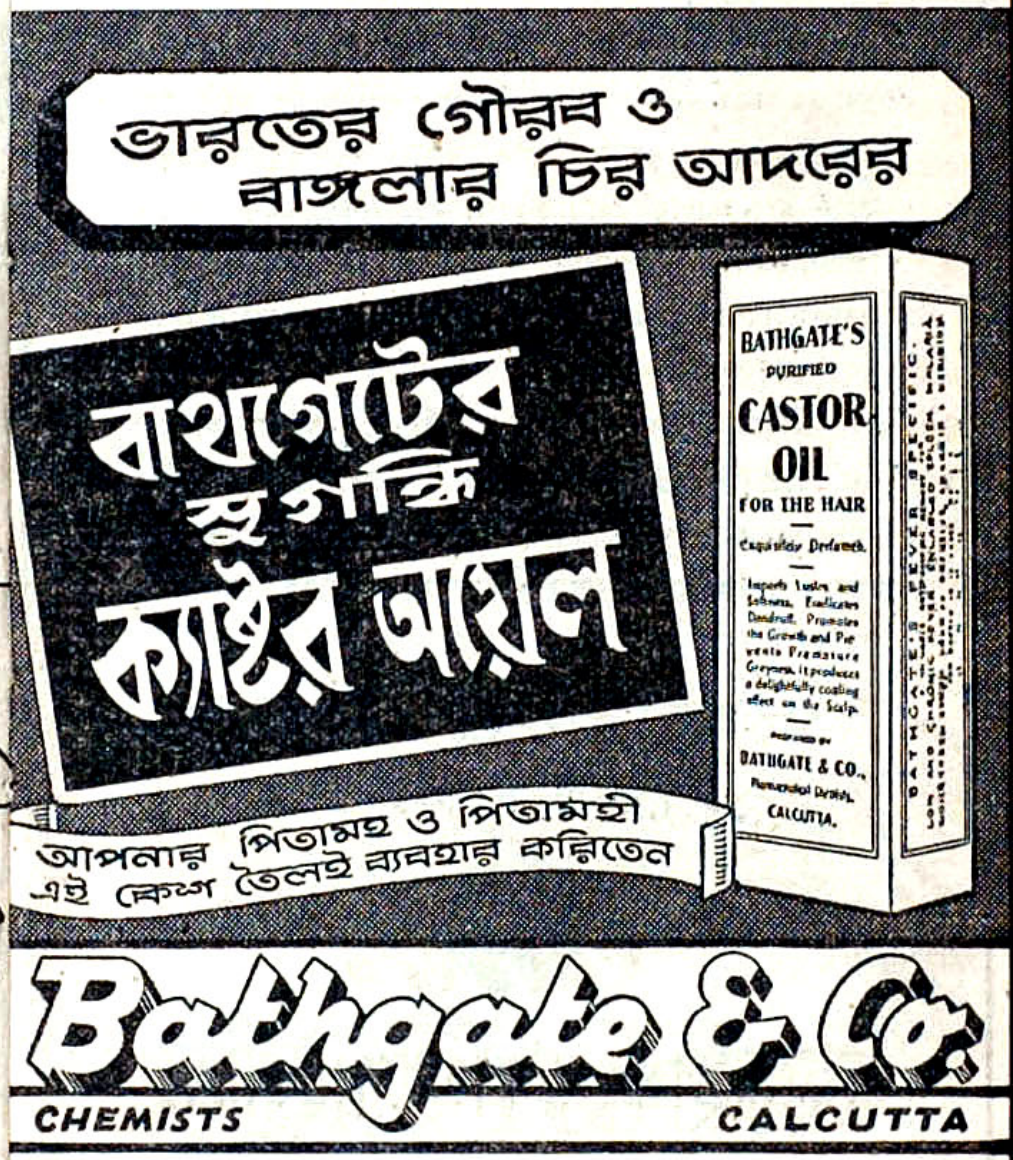

বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে চা-রসিক বলে' যাঁদের খ্যাতি ছিল ডক্টর জন্‌সন্ ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। চা না হলে কখনই তিনি কোন রচনায় মনোনিবেশ করতে পারতেন না। বিক্ষিপ্ত মনকে সাহিত্য-সাধনায় শান্ত ও সমাহিত করবার জন্যে এই মধুগন্ধী সুস্বাদু পানীয়টিই ছিল তাঁর একমাত্র নির্ভর। আর শুধু তিনিই ন'ন, হ্যাজলিট, ল্যাম্ব প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষীদের মধ্যে যাঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব অর্জন করে গেছেন তাঁরা চা-কে পানীয় মাত্র বলেই মনে করতেন না,—চা ছিল তাঁদের কাছে অফুরন্ত আনন্দ ও প্রেরণার উৎস। সুকবি কুপারের তো কথাই নেই, তিনি ইংরেজী সাহিত্যে "চায়ের আসরের কবি" বলেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যিকদের সঙ্গে চায়ের এই যোগা-যোগ আজ আর শুধু ইংরেজী সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁদের চা-প্রীতির নিদর্শন এখন পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যেই অল্প-বিস্তর খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার উদীয়মান কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "লেখার সময় স্তব্ধ অন্তর্লোকবাসী মনের ধ্যানযোগে চা শুধু তৃষ্ণাহরা পানীয়ই নয়, প্রেরণাময় সঙ্গীও বটে। ক্লান্তিতে যখন কল্পনায় অবসাদ আসে তখন চা আমাকে সতেজ করে তোলে নূতন প্রেরণায়। এ সময় চা আমার পক্ষে অপরিহার্য!"

প্রেরনার উৎস চা

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

LX 266

শনিবারের চিঠি
১৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৩

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা

আজ হতে বছর চল্লিশ-একচল্লিশ আগেকার কথা। স্বদেশী যুগ। শিবাজি-উৎসবে কবি শিবাজির উদ্দেশে রচিত তাঁর বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করছেন অথবা রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে গেয়ে জাতীয় ভাণ্ডারের জন্যে চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছেন অথবা ছাত্রদের সভায় সভাপতিত্ব করছেন অথবা টাউনহলের বিরাট সভায় "অবস্থা ও ব্যবস্থা" প্রবন্ধ পড়ছেন, গলা কাঁপছে আবেগে, শরীরে অনুভূত হচ্ছে রোমাঞ্চ, যার দ্যোতনা জনগণের মনে সঞ্চারিত হচ্ছে।

এ রকম পরিপ্রেক্ষিতে বা এ রকম সব চিত্রের নিরিখে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের সবটুকু ধরা পড়বে না। তাঁর স্বাদেশিকতা বুঝতে গেলে, তিনটি জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে—দেশ, কাল ও পাত্র। এই তিনটিরই ক্রমবিকাশ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে আমাদের একটা পুরো ধারণা হওয়া সম্ভব। পাত্র এখানে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

কবির স্বাদেশিকতার মধ্যে একটা বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সবসময়ে একই ধরণের দেশাত্মবোধ তাঁর ভেতরে ছিল এমন নজির নেই। দেশ ও কাল ভেদে পাত্র রবীন্দ্রনাথেরও মানসগঠন পরিবর্তিত হয়েছে। আবার কোন সময় কবি দেশ-কালকে তফাতে রেখেও গেছেন।

কবির স্বাজাত্যবোধের প্রমাণ হিসেবে তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক না হ'লেও ওই রচনাগুলি কেমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সম্ভব হয়েছে বা কোন্ সমসাময়িক অনুভূতির ওপর বিধৃত হয়ে আছে, তার বিশ্লেষণই বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক কবিমানসের স্বরূপ উদ্ঘাটিত ক'রে দেবে।

রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করলেন বহুখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে, যে পরিবার কলকাতায় স্থানান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির চাকরি আর ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন ক'রে ততদিন বিস্তৃত ভূসম্পত্তি কিনে ফেলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মালেন, তাঁরা বনেদী জমিদার, বিশাল গোষ্ঠী। এ পরিবারে ছেলেপুলেদের পালন করবার নিয়ম ছিল কড়া পাহারার মধ্যে বন্দী রেখে, যেটাকে রবীন্দ্রনাথ পরে 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র' নাম দিয়েছিলেন। সে যাই হোক, এই পারিবারিক পাহারা গোড়া থেকেই তাঁর মনে একটা দুর্বার বাসনা এনেছিল বাঁধন ছেঁড়বার, বাইরের জগৎকে জানবার।

তারপরে কৈশোরে পা দিতে না দিতে এল হিন্দুমেলার যুগ, সঞ্জীবনী সভার যুগ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারকে আজকালকার শ্রেণীসংগ্রামের আবহাওয়ায় বুর্জোয়া

ব'লে সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারলেও নতুন ভাবব্যঞ্জনার স্বকীয় অনুসরণে তাঁরাই ছিলেন অগ্রণী। জাতীয়তার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। তাই হিন্দুমেলার নেতৃত্বপদে আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে দেখেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্-মন্ত্রের জন্মের আগে সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সব ভারতসন্তান' গান শুনেছি, আরও দেখেছি সঞ্জীবনী সভার উদ্যোক্তা হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য রইতেন রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি তৎকালীন দেশপ্রেমিকেরা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার আদর্শে এতই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে, চারটে বীররসের নাটকই লিখে ফেললেন পর পর—'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী' আর 'স্বপ্নময়ী'। রবীন্দ্রনাথ তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ হ'লেও জ্যোতিদাদা তাঁকে সঞ্জীবনী সভা আর হিন্দুমেলার সভ্য ক'রে নিয়েছেন, অর্থাৎ জ্যোতিদাদার আওতায় তাঁর স্বদেশপ্রেমের প্রাথমিক উন্মেষ হ'ল। "হিন্দুমেলার উপহার" নামে তি'ন একটি কবিতা লিখলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের প্রসিদ্ধ গান "জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" এবং 'স্বপ্নময়ী'ও কয়েকটি গান তাঁরই রচনা। এ সমস্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুপ্রাণনাতেই সম্ভব হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে তাঁর জ্যোতিদাদার প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। এ কথা তিনি বহুবার স্বীকার করেছেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে, মাইকেল-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের যুগে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম-জীবনে, বাংলা দেশে তথা সারা ভারতে স্বাজাত্যবোধের উদ্বোধন হয়েছিল সত্যি, কিন্তু তার প্রসার ছিল সংকীর্ণ। তখনকার মনীষীরা এ সংকীর্ণতাকে এড়াতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথও না। তখন স্বাজাত্যবোধ ছিল ধর্ম বা সংস্কৃতিগত, ইংরেজীতে যার নাম Cultural বা Religious Nationalism। হিন্দুরা সব বিষয়ে অগ্রগামী ছিল ব'লে তখনকার জাতীয়তা মুখ্যত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ধ্যানধারণা হতে সঞ্জাত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত নাটকগুলির মধ্যে এক 'পুরুবিক্রম' ছাড়া সবকটিই মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর জাগরণের কাহিনী। 'পুরুবিক্রম' খালি আলেকজাণ্ডার ও পুরুরাজকে নিয়ে লেখা। বাস্তবক্ষেত্রেও হিন্দুমেলার কার্যকলাপে যদিচ স্বাধীনতালাভের সংকল্প স্ফুট ছিল, এ স্বাধীনতার সীমা যেন হিন্দুদের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই শেষ। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের শিবাজি-উৎসব পর্যন্ত এ মতের সত্যতা প্রমাণ করতে পারে। শিবাজি-উৎসব তখনকার দিনে জাতীয় উৎসব। ভারতের প্রথম বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কথিত, ইংরেজী ১৮৯৪ সালে সংগঠিত পুনার চাপেকর সংঘে যা হ'ত, বা বাংলা দেশে যা হয়েছে, সবেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল মারাঠাবীর শিবাজির স্বাধীনতার আদর্শ, লক্ষ্য ছিল সেই আদর্শের প্রচার। কাজেই এই গোষ্ঠী ও ধর্মগত স্বাধীনতার জল্পনা ক

সে-হিসেবে কাজ করার কল্পনা নিঃসন্দেহে উদার মতবাদের পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ইতিমধ্যে হয়ে গেলেও, না ছিল তখন গণসংযোগ, না ছিল কোন কাজকর্ম, না ছিল আজকের কংগ্রেসের সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গী।

তখনকার দিনে বঙ্কিমের মত অপেক্ষাকৃত উদারমতাবলম্বীরা বেন্থাম মিল বা কঁৎ পড়তেন। বঙ্কিম তো আবার মার্ক্স-এংগেল্‌সের 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' পর্যন্ত বাদ দেন নি। কিন্তু "সাম্য" "বঙ্গদেশের কৃষক", 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র কয়েকটি প্রবন্ধ প্রভৃতি ছাড়া বঙ্কিমের রচনা কদাচিৎ এই ধর্মগত বা গোষ্ঠীগত স্বাধীনতাদর্শের ওপরে অগ্রসর হয়েছে। এবং আগেই বলেছি, সাময়িকভাবে হ'লেও রবীন্দ্রনাথও একসময় সম্পূর্ণ অতিক্রম ক'রে যেতে পারেন নি এই কালপ্রবাহকে। তা সে বাঙালীসুলভ ভাবালুতার জন্যেই হোক, আর যে কোন কারণেই হোক। শিবাজি-উৎসবের প্রধান ভূমিকায়ও তাই তাঁকে দেখা গেছে এককালে। অবিশ্যি এটাও ঠিক যে স্বদেশী-যুগে কার্যকরী রাজনীতির আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেও প্রধানত এ সময় থেকেই তাঁর কবিমানসের পটপরিবর্তন শুরু হয়েছে, শুধু স্বদেশের মানুষকে নয়, পৃথিবীর মানুষকে ভালবাসবার কথা মনে হয়েছে তাঁর। অজস্র গান ও কবিতা লিখেছেন তখন। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ", "তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না", "বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান" "বাংলার মাটি বাংলার জল" ইত্যাদি সমস্ত বিখ্যাত গান ও কবিতাই ১৩১১-১২ বঙ্গাব্দের রচনা, অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের কালে।

ইংরেজী ১৯০৭ সাল নাগাদ অকস্মাৎ তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। রাখিবন্ধন, জাতীয় ভাণ্ডার, বক্তৃতা, করতালি, সব-কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলেন ক্রমশ। লোকে বললে, দেশের যুবশক্তিকে নানা দিক দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে ভাববিলাসী কবির, অন্তর্ধান অত্যন্ত অসঙ্গত হয়েছে। তবু কবি আর রাজপথে নামলেন না। তাঁর মানস তখন ওই যুগধর্মকে অস্বীকার করবার কথা ভাবছে। তিনি বুঝলেন, স্বদেশী-আন্দোলন উত্তেজনার ঘূর্ণাবর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। সমাজসংস্কারই যে রাষ্ট্রিক মুক্তির প্রথম উপায়—এ কথা দৃঢ়ভাবে তিনি বুঝলেন। আগে এই চিন্তাই তাঁর মনের মধ্যে দেখা দিলেও পারিপার্শ্বিকের আলোড়নে খুব স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় নি। তাই স্বদেশী-আন্দোলনের অনুপূরক হিসেবে বাঙালী ছেলেরা যে সন্ত্রাসবাদের দিকে পা দিল, তাতে ভাবাবেগের দিক থেকে কবির একটা স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি থাকলেও এ প্রয়াসকে গ্রহণ করতে পারেন নি। কেন না, বাইরের বিশাল সমাজের সঙ্গে এ প্রচেষ্টার কোন যোগসূত্র বিশেষ ছিল না। এ প্রয়াসও ছিল সংস্কৃতিগত স্বাদেশিকতার এক সংস্কৃত রূপ, বিশেষত অন্ধ ইংরেজবিদ্বেষের নমুনায় মলিন।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রত্যভিঘাত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে ধরা পড়েছে। দেশাত্মবোধের নামে কোনও সংকীর্ণতা, কোনও নীচ কাজ, কোনও মিথ্যাকেই কবি আমল দিতে রাজি নন। তাঁর মতে দেশধর্ম মানবতার ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বৃহৎ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ গৃহীত হবার পর অবশ্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আনবার জন্যে বিপ্লবপন্থা প্রকৃষ্ট পন্থা ছিল না, এটা বলা কখনও কখনও সহজ, কারণ রাষ্ট্রগুরু স্বয়ং এ কথা বলেছেন। কিন্তু "ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার" আর "পথ ও পাথেয়"র মত প্রবন্ধ বা 'ঘরে বাইরে'র মত উপন্যাস লেখা তখন সহজ ছিল না, তবু কবি এগুলি না লিখে পারেন নি। শুধু এই নয়, অগ্নিযুগের প্রত্যভিঘাত তাঁর মনকে এতটা নাড়া দিয়েছিল যে, পরিণত বয়েসেও 'চার অধ্যায়ে'র মত উপন্যাস লিখেছেন। এসবেরই মধ্যে তিনি সাময়িক চিত্তবিক্ষোভের অসম্বৃত বহিরঙ্গকে অপ্রধান ক'রে দেখেছেন আর সমালোচনা করেছেন। 'চার অধ্যায়ে' অতীন যে নিজের স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিল অথচ ফেরবারও পথ ছিল না, এর সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সেই স্বীকারোক্তির ('রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে') কতটা সামঞ্জস্য আর কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে, তা একমাত্র কবিরই জানা থাকবার কথা এবং আমাদের প্রয়োজনে গৌণ। এর থেকে আমরা পারি মাত্র তাঁর চিন্তাধারার গতিপথটা বুঝতে, আর অসংকোচে তা মেনে নিতেও ক্ষতি দেখি নে। এখানে ওখানে অতীনের জবানির তীক্ষ্ণ শ্লেষ বা খেদোক্তিগুলি কবির বেদনাই বহন করে। অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হ'লেও তাতে হার—কবির এ বাণী মানুষ যদি মনে রাখত!

প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ এমন স্বাদেশিকতা চান নি। তিনি চেয়েছিলেন একের সঙ্গে বহুর মিলন, বহুর সঙ্গে একের মিলন, সকলের মিলন। তা ছাড়া, সেই স্বদেশী-যুগেই তিনি বলতে চেয়েছিলেন, রাষ্ট্রিক পরাধীনতা কিছুই নয়, সমাজ স্বাধীন হ'লে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা আসতে বাধ্য। অপর পক্ষে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা পেয়ে গেলেও সমাজ স্বাধীন না হতেও পারে। এ দিক দিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর বেশ মিল আছে, তিনিই অবশ্য পূর্বসূরী। অনেক আগেই তিনি বুঝেছিলেন, সমাজকে ঢেলে সাজানো দরকার, লিখেছিলেন 'স্বদেশী সমাজ'। সক্রিয় রাজনীতির বিপথগামী আবর্ত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে এই স্বদেশী সমাজ সৃষ্টি করবার কাজেও রবীন্দ্রনাথ তখন আগুয়ান হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় তখন ক্রমে ক্রমে গ'ড়ে উঠছে। এখানে কবি একান্তভাবেই কর্মী। এবং শান্তিনিকেতনে বা নিজের জমিদারিতে গঠন-কাজের পরীক্ষা চালাতে গিয়ে কিছু কিছু সম্পত্তি খুইয়েছিলেন, এটাও আমাদের ভুললে চলবে না।

'স্বদেশী সমাজে'র বিরুদ্ধেও কিন্তু কিছু কিছু সমালোচনা অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর সমালোচনা তেমন না হ'লেও, বিশেষ কেউই তার মর্ম বুঝতে পারে নি। কেন না,

অত চিত্তমথনের দিনেও তিনি ইংরেজ তাড়াবার একটাও বিদ্বেষপূর্ণ কথা বলেন নি, কেবল গঠনকর্মের এক তালিকা উপস্থিত করেছেন। 'স্বদেশী সমাজ' তাই অনেকের অনুরাগ কুড়োতে পারল না। তবে আজকের দিনে আমরা তার মূল্য বুঝতে যেন পারছি। গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্যক্রমের এমন একটি দফাও বের করা শক্ত, যা রবীন্দ্রনাথের অতদিন আগেকার লেখায় ছিল না। এই সবের জন্যেই না পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর মিলন সম্ভব হয়েছে, এই সবের জন্যেই না রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর গুরুদেব। বস্তুত মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের অক্লান্ত অনুসারী—তাঁরা দুজনে একই ভাবের ভাবুক। "৪ঠা আশ্বিনে"র অল্প পরিসরেও এর প্রমাণ মিলবে।

এবম্বিধায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী ভাবধারা এগিয়ে গেছে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী স্বাদেশিকতা তাঁকে বারংবার ব্যথিত করেছিল। কিন্তু ১৯৩০-এ যখন সোভিয়েট-রাশিয়া ঘুরে এলেন, তিনি শান্তি পেয়েছিলেন সেখানকার সমাজব্যবস্থা দেখে। ফিরে এসে বেরোল 'রাশিয়ার চিঠি'। এ সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে অর্থনৈতিক দৈন্য দেখা দিয়েছে। বিশেষত ভারতে এর ওপর ছিল দ্বিতীয় অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন দমনে বিদেশী শাসকের নিষ্করুণ অত্যাচার। সোভিয়েটের পটভূমিতে খতিয়ে কবি বুঝলেন, তাঁর নিজের দেশ কত অসহায়। আজ নয়, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় নবযুগের আদর্শ তখনই তিনি অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এর পরে জওহরলাল ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে লক্ষ্ণৌ ও ফয়জাবাদে যা বক্তৃতা দেন, তা প্রায় সবই 'রাশিয়ার চিঠি'তে বলা হয়ে গিয়েছে।

প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিদেশে। ফিরে এলেন যখন, দেশে জাতীয়তার বান ডেকেছে। যিনি জাপানের বুকের ওপর জাপানীদের সংকীর্ণ দেশাত্মবোধকে কশাঘাত করেছেন, ইউরোপের মাটিতে দাঁড়িয়ে ইউরোপের আক্রমণাত্মক স্বদেশপ্রেমের কঠোর সমালোচনা করতে ভোলেন নি, তিনি নিজের দেশের এই আন্দোলনকেও হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না, যদিও অসহযোগের মর্মবাণী কবির আজীবন সাধনার সঙ্গে অভেদ। জাপানে, আমেরিকায়, ইউরোপে জাত্যাভিমানের প্রলয়ঙ্কর প্রকাশ তিনি দেখেছেন, ধর্মোন্মাদনাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের বিপদ তাই তিনি বুঝেছেন। তাঁর মনে কেবল ভয় এই, অসহযোগও যদি সে রকম কলুষিত রূপ পরিগ্রহ করে? বললেন, এ আন্দোলন নেতিবাচক। বিদেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান রত্ন রয়েছে, সে সব আহরণের পথ রুদ্ধ ক'রে শিক্ষার মিলন হওয়া সম্ভব নয়, এবং এমন ব্যবস্থা নেতিবাচক।

কিপ্‌লিং প্রমুখ কূপমণ্ডুক কবিদের ধারণায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন কখনই হতে পারে না। কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথ একদিন গেয়েছিলেন—"দিবে আর নিবে,

মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।" হালে অবশ্য আমরা শুনি, ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধেই ভারতবাসীর অভিযান, ব্যক্তিগতভাবে কোনও ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু প্রথম অসহযোগেরও অনেক আগে রবীন্দ্রনাথের "ভারত-তীর্থে"র মত কবিতা কতখানি বিপ্লবাত্মক, সে কথা ভেবে দেখলে অবাক হতে হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সময় উপাধি-পরিত্যাগের গুরুত্ব এর পরে বিবেচ্য। কিন্তু আজকের কেউ কেউ কবির এই প্রাগ্রসর মাত্রাচেতনার ক্রম[১] জেনে নিয়েও যদি তাঁকে সাম্প্রদায়িক ভেদসম্পন্ন ব'লে গণ্ডিবদ্ধ করতে চায়, বা "ভারত-তীর্থে"র মধ্যে অপ্রচ্ছন্ন হিন্দুরূপক[২] দেখতে পায় তো সে দোষ কবির নয়, বিভ্রান্ত উত্তরসূরীদের। জীবনের প্রায় অধিকাংশ সময়েই যাঁর মনের নায়ক বিশ্বমানব, সামান্য ধর্মাভিমান কেমন ক'রে তাঁতে বর্তাবে? এমন কি বঙ্গভঙ্গের দিনেও যখন কবি কিছুটা আবেগচপল ছিলেন, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তাঁর নিজস্ব ধারণাগুলি সব সময় ফুটে ওঠে নি পুরোপুরি—সেই রাখিবন্ধনের দিনেও তিনি মুসলমানদের হাতে মিলনের রাখি বাঁধতে গিয়েছিলেন। কেউ বেঁধেছিল কেউ বাঁধে নি। প্রকৃতপক্ষে এসব ইতিহাস ভুলে না গেলে কবির আজীবন শিবসাধনাকে আর অস্বীকার করা যায় না।

তিরিশের মুক্তিসংগ্রামের সময় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্তরদেবতা সাড়া দিয়েছিল, কারণ প্রথমবারের অসহযোগের ওপরে উন্নীত হয়েছিল এ আন্দোলন। এ আইন-অমান্য। রক্ষকরূপী বিদেশী ভক্ষকের অন্যায় অবিচারের আইন অমান্য করতে গেলে যে 'সাহসবিস্তৃত বক্ষপট' থাকা প্রয়োজন, তেমন দৃঢ়তা এ আন্দোলনের মধ্যে দেখেছিলেন ব'লে সমর্থন করেছেন। সত্যি বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ভাবধারার পরিবর্তন এতে বোঝায় না। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের নেতিবাচক বহিঃপ্রকাশের প্রতিই ছিল তাঁর বিরাগ, নইলে সত্যাগ্রহদর্শন আর সমাজসংগঠনের মূলতত্ত্ব ১৯২২ সালের রচনা 'মুক্তধারা'য় যেভাবে ফুটে উঠেছে, তা অতুল্য। তাঁর যা স্বপ্ন সেই আদর্শে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ভারতীয় রাজনীতির মান পরিবর্তিত হচ্ছিল ব'লেই রবীন্দ্রনাথ আইন-অমান্য এবং সত্যাগ্রহকে অর্ঘ্য দিয়েছেন। প্রাণশক্তির এই গতিধর্ম রবীন্দ্রনাথের চিন্তার এক-একটি অবিচ্ছেদ্য চরণ। কবির চিরকালের ধ্যান নবীন ও সবুজ প্রাণের

১ 'ধর্মপ্রচার' জাতীয় নিছক ধর্ম সম্বন্ধের আলোচনা হতেও রবীন্দ্রনাথের এই মাত্রা-চেতনার ক্রম কিছু কিছু জানা যায়। ওতে তিনি এমনও বলতে চেয়েছেন যে, সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্মসাধনাকে মানুষ যখন আধ্যাত্মিক সাধনা হিসেবে গ্রহণ করে, ধর্মসাধনা খণ্ডিত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

২ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'জাতীয় সঙ্গীতে'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মধ্যে অনুরণন তুলেছে। "ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"

এ সমস্তর মধ্যেই রবীন্দ্র-মননের একটা ঐতিহাসিক ক্রম র'য়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের এ ঐতিহাসিক বোধ আস্তে আস্তে প্রকট হয়ে উঠল 'পরিশেষ', 'রথের রশি', '৪ঠা আশ্বিন' প্রভৃতি রচনায়, যার জের 'প্রান্তিকে'ও কাটে নি। তবু 'পরিশেষে'র "প্রশ্ন"-জাতীয় কবিতায় কবির অন্তর্লোক যেন খানিক সংশয়ে দুল্যমান। ভগবান, যারা প্রত্যহের হিংসা ও বিদ্বেষবিষে তোমার স্বর্গরাজ্য বিষাক্ত ক'রে তুলল, তারা কি তোমার ক্ষমা পাচ্ছে? পাওয়া উচিত না হ'লেও এই প্রশ্ন উঠিয়ে তিনি নিজের কাছে মোহমুক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর সৃষ্ট 'গোরা'র ঘটনাবৈগুণ্যই তাঁর নিজস্ব জীবনাদর্শের বিশেষ বোধক। সংকীর্ণ জাতি বা ধর্মমত কাটিয়ে উঠে বাহির-বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ। গোঁড়া গোরাকে শেষ পর্যন্ত আইরিশজাত প্রতিপন্ন ক'রে পৃথিবীর পথে ছেড়ে দিলেন। পরবর্তী প্রবাহ বাস্তবে উহ্য থাকলেও আমরা কল্পনা ক'রে নিতে পারি। গোরার শুরু ও শেষ—এ দুয়ের মাঝখানে যে সোপান বর্তমান, তার এক-একটি ধাপ অতিক্রম ক'রে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মানস মহাজাতির রূপায়ণে রঙিন। কবির স্বাজাত্যবোধ এই চক্রপথই প্রদক্ষিণ ক'রে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা তাই সব সময় স্বার্থসঙ্ক সংকীর্ণতাকে পেছনে ফেলে গেছে, ভঙ্গ দিয়ে গেছে পারস্পরিক পরিবাদী রণে। কি "সত্যের আহ্বানে" কি "Nationalism"-এ, কি 'মুক্তধারা'র রূপকে, কি 'কালান্তরে'র প্রবন্ধগুলিতে তাঁর মত পরিস্ফুট। প্রধানত গীতধর্মী এবং রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত হওয়ায় 'রক্তকরবী'র সমাজচেতনা ততটা বিকশিত নয়, কিন্তু 'মুক্তধারা'য় সমসাময়িক কালের পশ্চাদপটে কবির সমাজমানস আশ্চর্য সচেতন। প্রথম মহাযুদ্ধের বড় বড় আদর্শ ইতিমধ্যে উবে গিয়েছে। মানুষের কেবল পাশবিক শক্তিই বাড়িয়ে তুলেছে যন্ত্রসভ্যতা। প্রভুজাতির দৌরাত্ম্য তখনও অবাধ। এর ওপর আছে সত্যাগ্রহের প্রশস্তি, যাতে ক'রে ইউরোপের ধনতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতার অকিঞ্চনতা আরও বেশি ক'রে ধরা পড়েছে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী, জাতি ও বর্ণদ্বেষক্লিষ্ট দেশাত্মবোধের উদ্ভব ও প্রসারণ যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতায় সম্ভব, তা কি সত্যিকারের স্বাধীনতা? বস্তুত এ রকম Aggressive Nationalism বা আক্রমণশীল জাতীয়তার পোষকতা করা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের অগোচর। যে স্বাদেশিকতা অপর কারও স্বাধীন সত্তার অপহ্নব ঘটাবার ইচ্ছে রাখে, কাজ কি তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে? বিদায় নেবার আগে তাই কবি ডাক দিয়ে গেছেন তাদের, 'দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।' এ আহ্বানে সাড়া দেবার ভার শুধু ভারতীয়ের নয়, বিশ্বমানবের, কবির যিনি মনের নায়ক।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা একটা আবেগপূর্ত আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়, তাঁর সারা জীবনেরই ধ্যান-ধারণার অবিভাজ্য অংশ। স্বদেশী-যুগে তাঁর প্রধান প্রকাশ হ'লেও পরে সে-ভূমিকা গৌণ হয়ে গেছে। কবির শেষের দিকের রচনাগুলি খানিকটা মৃত্যুকল্পী। তবে 'রোগশয্যা'র পর তাঁর মুক্তিস্নান হ'ল। সবরকম অন্ধকার থেকে মন তাঁর তখন জ্যোতির্ময় আলোকের এষণায় স্থির। কিন্তু তবু যেন তিনি সংসারবিমুক্ত নন। আরও স্বচ্ছ আরও গভীর দৃষ্টির অধিকারী হয়ে তিনি তখন ভারমুক্ত, প্রজ্ঞায় স্থিত। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত চেতনা নিয়ে বিচার করেছেন তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে, বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর নিজস্ব অনুভূতিকে। এই নিরাসক্তিই তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীকে পূর্ণাঙ্গ করেছে। এ সময়ে কবি 'শেষ খেয়া'র জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, তবু সংসার আর পৃথিবীকে ভালবেসেছেন ব'লে তাঁর পিছটান কাটছে না। "এবার ফিরাও মোরে"তে সুখদুঃখের সংসারে ফেরবার যে একটা অদম্য আকূতি দেখা গিয়েছিল, তা যেন গিয়েও যাচ্ছে না। চারিদিকে ভিড় ক'রে আসছে অনুন্নত মানুষেরা, শ্রমধর্মী সাধারণ মানুষেরা, বর্তমান সমাজব্যবস্থার বিষময় ফলে যাদের জীবন দুর্বহ, মানবতার অধিকারে যারা বঞ্চিত। হয়তো এরা বেশি অসহায় ব'লেই এদের বেশি ক'রে মনে পড়েছে সংবেদনশীল কবির! দুনিয়ার শোষণের হাত থেকে এদের বাঁচাবার উপায় কি? এর প্রতিকারের জন্যে কবি হয়তো আরেকবার নতুন মন্ত্রে বিষাণ বাজাতেন, কিন্তু তার আগেই কাল তাঁর জীবনতরীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অনাদি শান্তির পারাবারে।

রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনার এই-ই হচ্ছে ভূমিকা, যা তাঁর স্বদেশপ্রেমেরও বৃত্তি। 'চিত্রা'র ইঙ্গিত 'গীতাঞ্জলি'তে সার্থক হয়েছে, এবং তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের ভগবান স্বর্ণসিংহাসন ছেড়ে নেমে এসেছেন সংসারের পথের ধূলোয়, "সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে"। গেছেন "যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ, পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস"। ওই পথে পরবর্তী-কালেও রবীন্দ্রমানস এই মূল ভাব থেকে বিচ্যুত হয় নি বরং আরও পরিণত রূপ পেয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে একমাত্র 'রথের রশি'ই[৩] তো যথেষ্ট। ওতে কবি অবিশ্বাস্য বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। অনেক-দিনের অনড়ত্বের পর মহাকালনাথের রথ আজ বাধা-বন্ধহারা হয়ে ছুটে চলেছে। ইতিহাসের আবর্তনে রশি ধরেছে জনতা। এবার চাকার তলায় পড়বার পালা কুটিল

৩ 'রথের রশি'র ভাবাদর্শ কতকটা বিশ্বের পটভূমিতে। এরই ভারতীয় রূপ "৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩৯"-এর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে মহাত্মাজীর মৃত্যুপণ-অনশনব্রতের গূঢ়ার্থকে অনুধাবন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "আমাদের রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনা কেবলি ব্যর্থ হচ্ছে এই (সামাজিক) ভেদবুদ্ধির অভিশাপে।'

ধনপতি আর দাম্ভিক শস্ত্রপাণিদের। তাদের ধনভাণ্ডার আর শস্ত্রশালা সব গুঁড়িয়ে যাবে। "জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে"। কালের এই রথযাত্রায় কবিরও ডাক পড়েছে বহুবার, কিন্তু "কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারে নি সে পৌঁছতে"। শেষের দিকে কবির আত্মস-মালোচনার সুর। প্রগতিক চেতনার ধারক হয়েও তিনি তাঁর দুর্ভাগা দেশের অপমানিত জনতার প্রতি ঠিক সুবিচার করতে পেরেছেন কি না, এই চিন্তা তাঁকে আগাগোড়া পীড়া দিয়েছে। সেজন্যে তিনি আবাহনও জানিয়ে গেছেন আগামী দিনের সেই মহাকবিকে, যিনি অজের আশায় ধ্বনিত করতে পারবেন এদের ভগ্ন বুক, মূক মুখে দিতে পারবেন স্বপ্রকাশের ভাষা, জগতের সামনে মহীয়ান করবেন এদের জীবন, সত্য ক'রে তুলবেন তাঁর অভীপ্সাকে। কবির আবাহন ফলপ্রসূ হোক।

কবি তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। স্বদেশের মধ্যে জাতীয় জাগরণ দমনে বিদেশী শাসকের অত্যাচার; বিদেশে ফাসিস্ত ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়ার স্বাধীনতাহরণ, মদগর্বী জাপানের চীন আক্রমণ এবং সবার ওপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও সর্বাত্মক ধ্বংসপর্বের প্রারম্ভ। তাও তো তিনি দেখলেন না আগষ্ট অভ্যুত্থানের দিনে ভারতে সরকারী চণ্ডনীতি, দেখলেন না পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেখলেন না আণবিক যজ্ঞ। কিন্তু যা দেখেছেন, সেই দুঃস্বপ্নগুলিই তাঁর শেষ জীবনকে বিস্বাদ ক'রে তুলতে যথেষ্ট। তাঁর একান্ত ভালোবাসার পাত্র মানুষ আজ তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্বার্থের হানাহানিতে মানুষের ভগ্নাংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সংঘাতের কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, যেখানে আশ্রয় নিয়ে কবির মন কিছু স্বস্তি পেতে পারে। এ বেদনা কবি ভুলবেন কি ক'রে? তাঁর স্বপ্ন তো এ নয়, তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা যে মহাপৃথিবী গড়বার, গোটা মানুষ গড়বার, তা হ'লে কেন এমন হয়? তিনি কি মিথ্যাদ্রষ্টা? এর জবাব দিতে গেলে মানুষের প্রতি তাঁর সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে যেতে পারত, কিন্তু তিনি সত্যিকারের বিবর্তনবোধের অধিকারী হয়েছিলেন ব'লেই বুঝতে পারলেন, বর্তমানের এই ধ্বংসের মধ্যেই মানব-সমাজের ইতিহাস শেষ নয়। "যুগাবসানে লাগেই তো আগুন। যা ছাই হবার তাই ছাই হয়, যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের"। সুতরাং ভাঙার ভেতর দিয়েই গ'ড়ে উঠবে নতুন উপনিবেশ, গর্ভবেদনার পরেই প্রসূত হবে নবজাতক, দেশ কাল অগ্রাহ্য ক'রে জয়ী হবে শাশ্বত মানুষের ধর্ম। নতুন সমাজব্যবস্থায় তৈরি হবে নতুন স্বাধীনতা, তোমার-আমার সকলের স্বাধীনতা। আজকের রাত্রির এ তপস্যা কালকের সূর্যজলা দিন, আজকের সভ্যতার এ সংকট কালকের পরিপুষ্ট সৃষ্টি; আর এইখানেই কবির বিশ্লেষণ শেষ।

শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী

২

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট, জেলা হাবড়া, ১৩।৬।২৯

মণ্ট্, তোমার নামে তো আর ওয়ারেণ্ট ছিল না যে সাধু হতে গেলে? ব্যস্, আর না। এই পত্র পাবা মাত্র চলে আস্‌বে। আবার না হয় দিন কতক পরে যেয়ো ক্ষতি নেই। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমার কথাটা শুনো। তোমার বয়সে আমি চার-চারবার সন্ন্যাসী হয়েছি। ও অঞ্চলে বোধ করি মাছি আর মশা কম, নইলে হিন্দুস্থানী ব্যাটাদের পিটের চামড়া ছাড়া কার সাধ্য সে দংশন সহ্য করে! এ বাঙ্গালীর পেশা নয় বাপু, কথা শোন, চলে এসো। তুমি এলে এবার একসঙ্গে বর্ষার পরে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ একবার বেড়াতে যাবো। তুমি সঙ্গে না থাক্‌লে খাতির পাওয়া যাবে না, খাওয়া-দাওয়ারও তেমন সুবিধে ঘটবে না। কবে আস্‌চো পত্রপাঠ লিখে পাঠাবে। আমি ইষ্টিসানে যাবো।

আর একটা কথা। বায়ীন শুনেছি যে-কোন গাছের পাতা তোমার নাকের ডগায় রগ্‌ড়ে দিয়ে যে-কোন ফুলের গন্ধ শুঁকিয়ে দিতে পারে। উপেন বাঁড়ুয্যে বলে এটা সে কর্ত্তার কাছ থেকে মেরে নিয়েচে। আসবার সময় এটা তুমি শিখে নেবে। হঠাৎ সে মান্‌বে না, কিন্তু ছেড়ো না। দিন কতক তার আন্দামানের বাঁশীর খুব তারিফ করতে থাকবে এবং বইখানা সর্ব্বদাই হাতে হাতে নিয়ে বেড়াবে। এবং, এ বই এতদিন যে পড়োনি এই বলে মাঝে মাঝে তার সুমুখে অনুতাপ প্রকাশ করবে। খুব সম্ভব এই হলেই "বিভূতি"টা হস্তগত করে নিতে পারবে। উত্তর ভারত বেড়াবার সময় এটা বিশেষ কাজে লাগবে।

অনিলবরণ শুনেছি নাকি মাটির গুঁড়োকে চিনি করে দিতে পারে। বেশিক্ষণ থাকে না বটে, কিন্তু ৫।৭ ঘণ্টা চিনির মত দেখতেও হয়, খেতেও লাগে। এটাও নিশ্চিন্ত শিখে আস্‌বার চেষ্টা কোরো। হঠাৎ টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে পথে ঘাটে বিদেশে,—বুঝেচ ত? এটা শেখাই চাই। অনিলবরণ লোকটি সরল এবং ভালো মানুষ,—একান্তই যদি শেখাতে আপত্তি করে তো খুব ভূত পেত্নীর গল্প করবে। হলফ করে বলবে যে পেত্নী তুমি চোখে দেখেচো। তারপরে ভাব্‌তে হবে না,—অনায়াসেই কৌশলটা মেরে নিতে পারবে। আর এ দুটো সত্যিই যদি শিখে নিতে পারো ত ওখানে কষ্ট করে থাক্‌বারই বা দরকার কি?

সেদিন একটা সাহিত্যিক মজলিসে তোমাদের সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা শুন্‌ছিলাম। সুরেশ চক্রবর্ত্তী না কি সমস্ত মেয়েদের ন্যাংটো করে দেবার প্রস্তাব করে একটা কি কবিতা লিখেচে না এম্‌নিই কি একটা কথা। সকলে ভারি নিন্দে করছিল। করবারই কথা।

মেয়েদের ন্যাংটো করে সারবন্দি দাঁড় করিয়ে দিলেই যে তাদের অত্যন্ত রূপসী দেখতে হয় এ খবর তাকে কে দিলে? যে-ই দিয়ে থাক্, ভুল খবর দিয়েছে। তোমাদের আশ্রমটা চোখে দেখবার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়। কয়েকটা খবর লিখো—

আশ্রমে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কিরূপ? অনেকে বলে শ্রীঅরবিন্দের মেজাজ ভারি গরম। তিনি সকল সময়ে বার হন না তাই রক্ষে, নইলে যারা আশ্রম দেখতে যায় তাদের না কি সেই সময়টায় (অর্থাৎ inspection এর সময়টা) গা ঢাকা দিয়ে থাক্‌তে হয়। সুমুখে পড়ে গেলে দুর্গতির একশেষ হয়। এ সব কি সত্যি? ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে কেমন তিরিক্ষি হয়ে গেছেন। আমি অনেক আশ্রমের মোহন্তদের এই রুক্ষ স্বভাবটা লক্ষ্য করেছি। এই হয়ত এই line এ স্বাভাবিক। যাই হোক, যদি যাই এই খবরগুলো জানিয়ো।

অনেককাল তোমাকে দেখিনি। ভারি দেখবার ইচ্ছে হয়, গান শোনবার সাধ হয়। কবে আস্‌বে জানিয়ো। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পু:— "বিভূতি" দুটো আদায় করে আনাই চাই। সময়ে অসময়ে ভারি কাজে লাগে। যাই হোক্ শীঘ্র চলে এসো। সন্ন্যাসী হওয়া ভারি খারাপ মণ্ট্, আমার কথা বিশ্বাস কর। আজকালকার দিনে কিচ্ছু মজা নেই। কবে আস্‌বে নিশ্চয় লিখো।

ক্রমশ

পদচিহ্ন

(পূর্বানুবৃত্তি)

সমস্ত অস্পৃশ্য পল্লীটা শিউরে উঠল। ওগো মা গো, কি হবে গো! হে বাবা ধর্ম্মরাজ, হে দয়াময়, রক্ষা কর বাবা, রক্ষা কর।

বাউড়ীপাড়ার মাতব্বর নোটন বাউড়ী এসে দাঁড়াল সাতনের উঠানে। অন্য মাতব্বর অটল সে আগেই এসে ব'সে ছিল সাতনের বাড়ির দাওয়ায়। সাতন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে মাটির দিকে অর্থহীনভাবে তাকিয়ে রয়েছে, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে, সর্ব্বাঙ্গের পেশী এখনও কঠিন হয়ে রয়েছে। সাতনদের সংসার এখন সমস্ত পাড়ার মধ্যে জমজমাট সংসার। সাতনেরা সাত ভাই, পাঁচ ভাই উপযুক্ত, ভরাভর্ত্তি জোয়ান। সাতনের মায়ের ষষ্ঠ সন্তান পরী। পরীর বয়স সঠিক কত, সে সাতনের মা বলতে পারে না। বলে, নামপাড়ার মুখুজ্জেবাবুদের ছেলে গোবিন্দতে আর আমার পরীতে একদিনে হয়েছে। গোবিন্দের বয়স সতরো বৎসর তিন মাস। পরীর পিঠে পর পর দুই ভাই, পরস্পরের চেয়ে দু বছরের ছোট। পনরো আর তেরো বয়স হয় হিসেবে। এ বছর হিসেবটা

হয়েছিল বিশেষ ক'রে—এই কয়েকদিন আগেই। পরীর ঠিক পরের ভাইয়ের ভক্ত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে হিসেব হয়েছিল, পরীর মা মুখুজ্জে-বাড়িতে গিয়ে গোবিন্দের বয়স জেনে অটল দেওরকে দিয়ে তার থেকে দু বছর বিয়োগ করিয়ে ঠিক করেছিল 'নারানের' (নারানের) বয়স এখনও ষোলো পূর্ণ হয় নাই; সুতরাং ভক্ত হওয়া হয় নাই নারানের। ষোলো বছরের আগে ধরমের ভক্ত হতে 'নেষদ' (নিষেধ) আছে সাতনদের সংসারে। নিষেধ ক'রে গিয়েছে সাতনের 'কত্তামা' (ঠাকুরমা); সাতনের ঠাকুরমায়ের এক ভাই মারা গিয়েছিল ষোলো বছর বয়স পূর্ণ হবার আগে ধরমের ভাঁড়াল মাথায় ক'রে। ভাঁড়াল রেখে এসে ছেলে বাড়ি ফিরল 'মাথা গেল, মাথা গেল' রব তুলে। গায়ে সে কি জ্বর! ধান দিলে খই হয়ে ফুটে যায়, এমন তাপ গায়ে। ঘন ঘন প্রস্রাব। নাকের সে কি শব্দ! আর বকুনি—ধন্বন্তরো! ধন্বন্তরো! বৈদ্যতে বললে, তাত লেগেছে। কিন্তু ওষুধে কিছু হ'ল না। বৈদ্যের কথা বিশ্বাস করে নাই কেউ। ছেলেটা ধড়ফড় ক'রে ম'রে গেল। সেই অবধি সাতনের ঠাকুরমায়ের মা নিষেধ দিলে, ষোলো বছর না পূরলে ভক্ত হ'লে 'খ্যানত' অর্থাৎ খুঁত হবে। তবে বাপ যদি থাকে, তবে ষোলো বছর না হ'লেও ছেলে বাপের কাছে উতুরী চেয়ে নিতে পারবে। যাক সে কথা। ষোলো বছর বয়স না হওয়ায় নারানের ভক্ত হওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু জোয়ান সেও প্রায় পুরো হয়ে উঠেছে। সেই এখন ঘর-সংসারের কর্তা। পাঁচ ভাই এখন চাষের কাজ করে, চাষের কাজ না থাকলে জনমজুর খাটে; তাদের সঙ্গে থাকে পাঁচ বউ। নারান এতদিন বাবুদের ঘরে রাখালের কাজ করত, সে কাজ থেকে এবার তাকে ছাড়িয়ে ঘরের কাজে দেওয়া হয়েছে। ঘরের কাজ এবার অনেক সাতনদের। এবার তারা দু জোড়া বলদ কিনেছে; দু জোড়া হালের পিছনে খাটবে পাঁচটা মরদ, পাঁচটা মেয়ে। ভাগে জমি নিয়েছে। স্বর্ণবাবু জমি দিয়েছেন কুড়ি বিঘে। আরও বাবুদের জমিও পেয়েছে সাতন। এবার মোট তিরিশ বিঘে জমি। জমি আরও অনেকে দিতে চায়, কিন্তু নিয়ে করবে কি সাতন? গরু দু জোড়া ছোট, বয়সেও কাঁচা, এখন বেশি চাপ দিলে হয়তো ভরা চাষের সময় অক্ষম হয়ে পড়বে। তা ছাড়া এত অল্প সময়ের মধ্যে আর তারা কি করবে?

পরী শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে তিন মাস। তার মাস খানেক পরেই নোটন মুরুব্বি এল। বললে, সাত ভাই তোরা হাল কর্। পরের ঘরে খেটে মরছিস কেনে?

হাল করা কি সোজা কথা কাকা? টাকা কোথা?

বাবুর কটা ষাঁড় আছে। যাস বাবুর কাছে, আমি ব'লে দোব। বাবু অর্থাৎ স্বর্ণবাবু। স্বর্ণবাবুর প্রিয়পাত্র নোটন।

ঠিক এই সময়ে জলের কলসী নিয়ে পরী ঘরে ঢুকছিল, কথাগুলি শুনে সে ব'লে গেল, মরণ! ঘরে ঢুকে সে অকারণে খিলখিল ক'রে হাসতে লাগল।

সাতন চুপ ক'রে রইল, উত্তর দিলে না। স্বর্ণবাবুর সোদান গ্রহণ করতে গেলে কি দিতে হবে সে অনুমান করতে পারে। কিন্তু সে কে? বধূদের মধ্যে—? ভুরু কুঁচকে উঠল তার।

নোটন বললে, তোর মাকে পাঠিয়ে দিস আমার বাড়ি।

সাতন এ কথারও কোন জবাব দিলে না। ভাবতে লাগল।

ব্যাপারটা সহজ ক'রে দিলে মা। মায়ের অনেক বয়স হয়েছে। আপত্তি করেছিল সাতন; সাতনের মা বলেছিল, তু থাম্ রে। তোর প্যাটে (পেটে) আমার জন্ম, না আমার প্যাটে তোর জন্ম? সে নিজে গিয়েছিল স্বর্ণবাবুর কাছে। নোটন অবশ্য সঙ্গে গিয়েছিল। এক জোড়ার বদলে দু জোড়া ষাঁড় সে বাবুর কাছে আদায় ক'রে নিয়ে এল।

এটা সেই যে রাত্রে স্বর্ণবাবুর বাগানবাড়ির দাওয়ায় দারোগা এবং স্বর্ণবাবুর মাঝখানে নিকষ পাথরে গড়া নারীমূর্তির মত একটা কালো মেয়েকে অনাবৃত দেহে প'ড়ে থাকতে দেখেছিল কিশোর, সেই দিনের কথা।

ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কতকাল থেকে চ'লে আসছে এই ধারাধরন, সে হিসেব কেউ করে না। ওদের করার কথাই নয়। ওরা কুড়ির বেশি গুনতে জানে না। কাল ব'লে কিছু জানেই না ওরা। বয়সের হিসেব করে বাবুদের ছেলেদের বয়স ধ'রে। নিজের বাপের নাম জানে, পিতামহের নাম প্রবীণকে জিজ্ঞাসা না ক'রে বলতে পারে না। অতীতের কথা ওরা জানে না। বাবুরা বলে, বহুকাল আগে এখানে এক বাউড়ী রাজা ছিল। একটা মজা দিঘি দেখিয়ে বলে, বাউড়ী রাজার দিঘি। সে কথা শুনেও ওদের মনে এতটুকু চাঞ্চল্য জাগে না। কোন প্রশ্ন মনে ওঠে না। বাপপিতামহের আমলের কয়েকটা কথা জানে। তার মধ্যে একটা কথা হ'ল, ঠাকুরমায়ের, মায়ের কলঙ্ক-কাহিনী। সে কাহিনী লজ্জার নয়, ঘৃণার নয়, শুধু একটু রসঘন মাত্র। বাল্যকাল থেকে দেখেছে, বাবুদের পেয়াদারা আসে সন্ধ্যাবেলা তাদের পাড়ায় বেড়াতে; পুরুষদের সঙ্গে, মেয়েদের সঙ্গে হাসে গল্প করে, ক্রমে পুরুষেরা উঠে যায়, পেয়াদা তবু ব'সে থাকে। রাজমিস্ত্রীরা আসে, তারাও ব'সে থাকে পেয়াদাদের মত। মেয়েরা তাদের কাছে মজুরনী খাটে। মধ্যে মধ্যে বিদেশী মিস্ত্রীদের সঙ্গে দু-চারটে মেয়ে পালিয়েও যায়। মধ্যে মধ্যে শোনে, মেয়েরা কেউ গিয়েছিল কাঠ ভাঙতে বাবুদের বাগানে, সেখানে বাবুদের ছেলেরা ডেকে নিয়েছে। গ্রামের বেনেদের সাহাদের কয়েকজনের বাড়িতে তাদের পাড়ার কয়েকটি মেয়ে স্থায়ীভাবে বাস করছে। অধিকাংশই ঝিউড়ী মেয়ে, জন দুই বহুড়ীও আছে। মধ্যে মধ্যে রাত্রে ঘুম ভেঙে যায় উন্মত্ত চীৎকারে। প্রবীণেরা শিউরে উঠে বলে, বাবুরা মেতেছে।

মদ খেয়ে মধ্যে মধ্যে বাবুদের ছেলেরা মাতাল হয়ে আসে। কারও দোরে লাথি মারে। সকালে দেখা যায়, বাবুদের ছেলে ওদের কারও ঘর থেকে ঘুম ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে। অথবা কারও বউ বা বেটী বাবুপাড়া থেকে ভোরে ফিরে আসছে নিজের বাড়ি। খুঁটে বাঁধা একটা আধুলি কি একটা সিকি অথবা একটা টাকা।

এ ক্ষেত্রে পরীর ভাগ্য তো কল্পনাতীত সৌভাগ্য বলতে হবে। দু জোড়া ষাঁড়। অন্তত পঞ্চাশ টাকা দাম। শুধু বাবু ব'লে দিয়েছে, খবরদার, আর কোথাও যদি যাওয়া শুনি, তবে—। তবে কি করবেন বা কি হবে, সে কথা বাবু স্পষ্ট বলেন নাই, কিন্তু সে যে কি না হতে পারে তা ভেবে উঠতে পারে না সাতন বা সাতনের মা। ঘরের চাল কেটে তুলে দিতে পারে, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে ঘর, চুরির দায়িতে এজাহার করতে পারে থানায়, থানাতেই বা যেতে হবে কেন, ধ'রে নিয়ে গিয়ে খুঁটি কি থামের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে, জুতো কি বেত মেরে পিঠের চামড়া তুলে দিতে পারে। খুন ক'রে লাশ গাঁয়ের ক'রে দিলেই বা কে কি করতে পারে?

এই কারণেই চন্দ্র গড়াঞীয়ের আক্রোশ। কয়েকদিন থেকেই সে আসা-যাওয়া শুরু করেছিল। পরীর নামটা এখন গোটা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এ পাড়ার রাস্তা দিয়ে ছোকরাদের যাতায়াত অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। বাবুদের ছেলে, বেনেদের ছেলে, সাহাদের ছেলে থেকে আরম্ভ ক'রে শেখ পাড়ার ছোকরা পর্যন্ত। মাত্র তিন-চারদিন মজুরনী খাটতে গিয়েছিল পরী। সেইখানে তাকে প্রথম দেখেন স্বর্ণবাবু। তারপর তার খাটতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরী-পরী শব্দটা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। পরীর মায়ের অহঙ্কার বেড়েছে। সে বাবুর কাছে তালগাছ আদায় করেছে। কোঠা ঘর করবার কথা বলেছে ছেলেদের। পাড়ায় সে হেলেদুলে বড় বড় কথা ব'লে ঘুরে বেড়ায়। চন্দ্র গড়াঞীকে সে গোড়াতেই বলেছিল, গড়াঞী, ওদিকে তাকিও না বাপু। বাবু জানতে পারলে তোমাকেও জ্যান্ত রাখবে না, আমাদের তো গুষ্ঠীসুদ্ধকে মেরে ফেলাবে।

গড়াঞী শোনে নাই কথা।

তার ফলে একদিন সন্ধ্যাবেলা গড়াঞী তাড়া খেলে বাবুর চাপরাসীর কাছে। সেদিন অনেক লাঞ্ছনা হ'ত গড়াঞীর। কিন্তু ভাগ্য ভাল তার, তার নাগাল পায় নাই চাপরাসীরা। সামনে পড়েছিল একটা পাঁচিল, লম্বা মানুষ চন্দ্র, তার উপর সে চন্দ্র গড়াঞী, মুহূর্তে পাঁচিলটার মাথায় একটা হাত দিয়ে লাফ দিয়ে টপকে ওপারে প'ড়ে ছুটে পালিয়েছিল। সাতনদের যোগসাজস ছিল এর মধ্যে এ কথা সত্য এবং সাতন সেদিন 'ধর ধর' ব'লে উচ্চ চীৎকার ক'রে হা-হা ক'রে হেসেছিল এ কথাও সত্য। তারই ফলে চন্দ্র করলে এই কাণ্ড।

নোটন বললে, তুই কিছু না ব'লে বাবুর কাছে এলি না ক্যানে? দেবাংশীর কথা নিয়ে পড়তে গেলি ক্যানে?

অটল বললে, মতিভ্যম দাদা, মতিভ্যম (মতিভ্রম) হয়েছিল আর কি!

নোটন বললে, চল্, আমার সঙ্গে চল্।

কোথা?

দেবাংশীকে ধরি গিয়ে। একটা পাঁঠা বরং দেখ্। বাবার থানে বলি দিবি।

না।

না কি রে?

না না না।—চীৎকার ক'রে উঠল সাতন।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল পরী। বললে, না লয়। যাও, ওঠ! পরীরও পরিবর্তন হয়েছে; এ-সংসারের সকল সৌভাগ্যের যে কেন্দ্রস্থল সে, এ বোধ তার জন্মেছে। বিজ্ঞতার সঙ্গে দাদাকে উপদেশের খোলস পরিয়ে আদেশই করলে সে। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। প্রচণ্ড ক্রোধে উঠে পরীর চুলের মুঠোয় ধ'রে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলে দিলে সাতন। —হারামজাদী! তারপর কিল চড় লাথি মারতে লাগল, উন্মত্তের মত অশ্লীলতম গালাগালি দিতে লাগল।

হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল সকলে। নোটন অটল জাপটে ধ'রে ফেললে সাতনকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সাতন। পরী কিন্তু হাসিমুখে উঠে নিজের কাপড় এবং চুল সম্বৃত ক'রে বললে, ছেড়ে দাও কাকা, আরও ঘা কতক মারুক উ আমাকে। রাগটা পড়ুক ওর।

পরীর হাসিতে এবং কথায় ব্যাপারটা সহজ হয়ে উঠল। সাতনকে ছেড়ে দিয়ে নোটন বললে, সাধে কি আর আমাদিগে জাত-ছোটনোক বলে রে!

অটল বললে, কোধ চণ্ডাল কি না, উনি ঘাড়ে চড়লে মানুষ তখন চণ্ডাল। আরে—আরে—আরে— এই যা!

মাঠ থেকে রোদে উত্তপ্ত হয়ে একপাল শূকর কাদা মেখে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ ক'রে এসে দাঁড়াল উঠানে। তারপর হঠাৎ, সম্ভবত ছায়ার প্রত্যাশায় সকলকে ঠেলেঠুলে দাওয়ার উপর উঠে গেল। তাদের অভিযানে বিব্রত হয়ে দাওয়ার কোণ থেকে প্যাঁক-প্যাঁক শব্দ ক'রে বেরিয়ে এল একপাল হাঁস। গোটা কয়েক মুরগী ফরফর ক'রে উড়ে বেরিয়ে গেল। মুহূর্তে সমস্ত সংসারটা বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল। তিক্তচিত্ত মানুষগুলি প্রত্যেকেই বিরক্তি অনুভব না ক'রে পারলে না। সাতনের মা অভিসম্পাত দিতে আরম্ভ করলে, মরুক, মরুক, মরুক। সাতনের হাতের কাছেই প'ড়ে ছিল একটা বাঁশের ডগার

দিকের টুকরো, সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে সে উঠে শূকরগুলোকে ঠ্যাঙাতে শুরু করল এবার। পৃথিবীটাকে রসাতলে দিতে পারলে তার ক্ষোভ আক্রোশ মেটে।

* * *

সাতন কিছুতেই আর গেল না। সে যে সেই 'না' ধরেছিল, তাই-ই ধ'রে রইল। বললে, মরি মরব। আমি যাব না।

মা বললে, ওরে 'খালভরা' 'ডাকাবুকো', তোর যেন ভয় নাই, কিন্তুক গোটা সংসারটাকে ছারেখারে দিবি?

সাতন বললে, বলেছি আমি, দেবাংশী আমাকে বলেছে নিব্বংশ হবে। 'খ্যানত' হয়, আমার ওপর দিয়ে যাবে। নিব্বংশ হই, আমি হব। অন্যের সাথে তার সম্বন্ধ কি? ভয় লাগে তোমাদের আমি 'ভিন্নু' (ভিন্ন) হছি, আজই ভিন্নু হছি আমি।

সাতনের স্ত্রী দাওয়া থেকে চীৎকার ক'রে উঠল, আমি মাথা খুঁড়ে মরব। আমি গলায় দড়ি দোব।

সাতন বললে, দে গা, মর্ গা। মন যদি হয় বল্, আমি তোকে 'ছাড়ান-বিত্তেন' দিছি, চ'লে যা, অন্য লোককে সাঙা কর্ গা। 'হিয়ে খোলসে' (হিয়া খোলসায়) বলছি আমি, চ'লে যা।

মা চীৎকার ক'রে উঠল, তা ব'লে বিধেন তো একটা করতে হবে?

বিধেন? এর আবার বিধেন কি? বলি, আমাকে যে নিব্বংশ হবে বললে দেবাংশী, আমার অপরাধটা কি? ওর কন্যের কথা কি আমি মনে গ'ড়ে মিছে ক'রে বলেছি? বলি, কথাটা সত্যি, না মিছে?

সত্যি হোক, মিছে হোক, তোর বলবার দরকার কি?

দরকার কি? একশো বার, হাজার বার, পাঁচ হাজার বার দরকার আছে। আমাকে বললে ক্যানে? হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। উঠানে পায়চারি করতে করতে বললে, এখন হয়েছে কি? একটা ঢোল কিনব, নয় তো ডুবকি কিনব, কিনে গাঁয়ে ভিন গাঁয়ে বাজাব আর ব'লে আসব। দেবাংশীর কন্যের কথা বলব, চাঁদা কুলুর জাতজ্ঞাত—'গিরি', 'তারি', 'চারি'র কথা বলব। 'গড়াঞীদেরই তিন কন্যে গিরি, তারি, চারি', যাই বলেহারি। খানায় ছামনে বাড়ি।'

নোটন এবার ধমক দিয়ে বললে, ব'স, যা বলি তাই শোন্।

কি?

এখানে না যাস, চল্, আমার সঙ্গে গ'লপাড়া (গোয়ালপাড়া) চল্। সেইখানে বাবার থানে মানত ক'রে আসবি, পূজো দিবি, বলি দিবি; মন হয় তো উতুরী লিবি, গ'লপাড়ার বাবার থানে।

অটল এতক্ষণ ব'সে ছিল চুপ ক'রে, সে বললে, এই ভাল বলেছ। এও বাবা, সেও বাবা। এ তো তোমার মাথার ওপরে আকাশের চাঁদ, যেখানে যাবে তুমি সাঁতে-সাঁতে (সাথে-সাথে) চলবে। ই গাঁয়েও চাঁদ, উ গাঁয়েও চাঁদ, সি গাঁয়েও চাঁদ। অথচ সেই এক তোমার মাথার ওপরের চাঁদ।

সাতন এবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, চল্। তাই চল্। নতুন গামছাখানা টেনে সে গায়ে জড়িয়ে নিলে। তারপর হঠাৎ সে হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল—বিচার কর, বিচার কর তুমি বাবা ধরম, তুমি ন্যায্য বিচার কর।

গোয়ালপাড়াতে এ অঞ্চলের আট-দশখানা গ্রামের মধ্যে ধরম-পূজোয় সমারোহ সবচেয়ে বেশি। এ অঞ্চলে অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গে বিশেষ ক'রে রাঢ় অঞ্চলে প্রায় গ্রামে গ্রামেই ধর্ম্মরাজ-পূজা হয়। তার মধ্যে প্রসার-প্রতিপত্তি সকল ধর্ম্মরাজের সমান নয়। যে দেবতা যেমন জাগ্রত, অর্থাৎ মনস্কামনা সিদ্ধ করতে, রোগ ভাল করতে যে ধর্ম্মরাজ যেমন পারেন, তাঁর প্রতিপত্তি তেমনই বেশি। এ জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ 'বেলের' ধর্ম্মরাজ বাবা। বাতব্যাধির অব্যর্থ ওষুধ আছে বাবার। মাটি তেল আর লতাপাতার ওষুধ। দেশদেশান্তর থেকে লোক আসে। কলকাতা, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ, রাজসাহী পর্য্যন্ত বাবার ভক্ত আছে। 'ভাসতোড়' গ্রামেও বাবার প্রসার খুব, ওখানে আছে অম্বলের ব্যাধির ওষুধ। 'সিজেকড্যাং' গ্রামের বাবার আছে হাঁপানির মাদুলি ও ওষুধ। এসব জায়গায় হাজারে হাজারে লোক জমায়েত হয়। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, মীর, খাঁ, শেখ সব ঘরেরই ভক্ত আছে। হিন্দুরা এ পূজার সময় উপবাস করে, মাটির ঘোড়া ও পূজা পাঠায়, অনেকে বলি দেয়, মীর-সাহেব, খাঁ-সাহেব, সেখজীরা মাটির ঘোড়া ও পূজা পাঠায়। গোয়ালপাড়ার ধর্ম্মরাজের আছে চোখের অসুখের ওষুধ এবং 'আজন' (অঞ্জন)। লোকে বলে, বাবার 'আজনে' চোখের ছানি পর্য্যন্ত কেটে যায়। বহু স্থান থেকে ভক্ত আসে; বাইরের লোকই আসে প্রায় ছশো আড়াইশো। তা ছাড়া আশপাশ গ্রামের ভক্তও অনেক। ঢাক আসে পঞ্চাশ-ষাটখানা। বলি হয় তিরিশ-চল্লিশটা। নবগ্রামের ধর্ম্মরাজের ওষুধের তেমন কোন নামডাক নাই, কিন্তু নবগ্রাম এ-অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ গ্রাম, সেই হিসেবে এখানকার চন্দ্র গড়াঞী প্রমুখ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎসাহীরা গোয়ালপাড়ার ধর্ম্মরাজের উৎসবের সঙ্গে বেশ একটি প্রতিযোগিতা করবার চেষ্টা করে। এ গ্রাম থেকে কেউ যাতে ভক্ত ওখানে না যায়, তার জন্য তাদের চেষ্টা যথেষ্ট। বলে, আমাদের হ'ল জমিদার ধরম। ওদের ধরম হ'ল আমাদের প্রজা। ওখানে যাবি কি?

নবগ্রামের জমিদারি-স্বত্বে এখানকার বাবুরা অধিকারী। স্বর্ণবাবু তাঁদের অন্যতম।

সরকারবাবুরা আছেন; শ্যামাদাস আছেন; সম্প্রতি দশ-বারো দিন আগে গোপীচন্দ্র আড়াই পয়সা অংশ কিনেছেন পাঁচশো টাকায়। একশো টাকা পয়সা হিসেবে এর আগে বিকি-কিনি চলছিল; এবার সরকার-বাবুদের একজন নাজেহাল শরিক ওই অংশটা বিক্রি করতে উদ্যত হয়েছিল আপনাদের সরকারগোষ্ঠীর মধ্যেই। ক্রেতা ছিলেন বংশলোচন। একশো টাকা হিসেবে দাম-দর সব স্থির, হঠাৎ স্বর্ণবাবুর লোক এসে হাঁকলে, একশো পঁচিশ। শ্যামাদাস দেড়শো দর পাঠালেন। গোপীচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র ছিলেন কলকাতায়, বংশলোচন তাঁকে টেলিগ্রাম করলেন। কীর্ত্তিচন্দ্র পরদিনই এসে একেবারে দুশো টাকা পয়সা দাম হেঁকে দিলেন। রেজেষ্ট্রী হয়ে গেল। কীর্ত্তিচন্দ্র এবার পাঁচখানা ঢাকের খরচ দিয়েছেন গোয়ালপাড়ায় পূজায়। বলেছেন, ভাঁড়াল নিয়ে ভক্তের দল এখানে এলে, মাতব্বরেরা যারা উপবাস করে না, তারা এখানে শরবত, পান, তামাক খাবে।

এসব ব্যবস্থায় চন্দ্র গড়াঞীদের দল একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গোয়ালপাড়ার ধর্ম্মরাজের পূজার সমারোহ বেশি হ'লে তারা নিজেদের অপমানিত বোধ করে। ঠিক এই কারণেই সাতন আরও খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল।

নোটন অটল সঙ্গে গেল।

ওরা চ'লে যেতেই, পরী খাটো কাপড়খানা ছেড়ে একখানা পরিচ্ছন্ন দশহাত শাড়ী প'রে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

মা বললে, কোথা যাবি? এই ঝাঁ-ঝাঁ 'দোপোর' (দুপহর) বেলায়?

মৃদুস্বরে পরী বললে, যাব বাবুর কাছে।

মরণ! লাজের মাথা একেবারে খেলি? দিনে 'দোপরে'—

তু সুদ্ধ সঙ্গে আয়। আমি চাঁদা কুলুর কথা ব'লে আসব বাবুকে। দাদাকে বলেছে দারোগা জমিদার তোর বোনাই। বিচার করুক বাবু।

বাবুর দৃষ্টি দেখে কিন্তু পরী শুকিয়ে গেল। রাত্রিবেলার সে চাউনি, আর এ চাউনিতে আকাশপাতাল তফাত। আশ্চর্য্যের কথা, সে চাউনির আভাস পর্য্যন্ত খুঁজে পেলে না, চোখের কোথাও কোন কোণে। কোঁচকানো ভ্রূর মধ্যে এমন রূঢ় দৃষ্টি, সে আর দেখে নাই। পরী একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। বুকটা তার দুরুদুরু ক'রে কাঁপছিল, একটা আবেগও ছিল, মধ্যে মধ্যে হাসিও হাসছিল। লজ্জা এবং আনন্দের হাসি। চেষ্টা করছিল, বাবুর চোখে চোখ পড়লেই সে ইশারা ক'রে ডাকবে। কিন্তু তার কোন অন্যমনস্কতা অথবা নতনেত্রতার অবসরে বাবু তাকে দেখেছিলেন। তিনি ডাকলেন, কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

সে ডাকে চমকে উঠল পরী।

দেখ্ তো রে, কে একটা মেয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে? দেখ্ তো কি চায়?

মেয়েটি যে পরী এবং সে যে কি চায়, স্বর্ণবাবু তা জানেন। সকল খবরই তাঁর কানে এসেছে। তাঁর অন্তরের মধ্যে ক্ষোভ টগবগ ক'রে ফুটছে গলন্ত ধাতুর মত। ইচ্ছে হচ্ছে, ওই গড়াঞীটাকে নিয়ে এসে চাবুক মেরে রক্তাক্ত ক'রে দেন, যে জিভে ওই কথাগুলো উচ্চারণ করেছে সেই জিভটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলেন। কিন্তু সে হয় না। সমাজ আছে, কীর্ত্তিচন্দ্র আছেন। আরও আছে, বংশলোচনকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু রাধাকান্ত সম্বন্ধে আশঙ্কা আছে। সম্প্রতি রাধাকান্তও তাঁর উপর বিরূপ। তিনি সেই ষোড়শীকে যে দিন রাত্রে চাইতে গিয়েছিলেন মদের নেশার ঝোঁকে, সেই দিন থেকে রাধাকান্তের সঙ্গেও তাঁর প্রীতির সম্বন্ধ ঘুচে গিয়েছে, কথায় কি ব্যবহারে কোন বিরূপতা রাধাকান্ত প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু স্বর্ণবাবু অনুভব করতে পারেন সেটা।

তিনি রূঢ়কণ্ঠে বললেন, যা যা। ভাগ্ এখান থেকে। ছেনালি করিস, ছেনাল বলেছে, তার আবার বিচার কিসের? যা। যা এখান থেকে।

পরীর সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল। সে নড়তে পারছিল না। স্বর্ণবাবু চাপরাসীটাকে বললেন, এই, ওকে বার ক'রে দে।

চাপরাসী তার পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে বাইরে নিয়ে এল। এবার পরী হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করলে। মৃদুস্বরে কাঁদছিল সে, ও মা গো, ওগো মা গো! ওগো মা গো! ওগো বাবা গো!

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল

(পূর্বানুবৃত্তি)

২

And this defendant further answering denies that the said Rameaunt Roy and Juggomohun Roy or either of them had at any time any right title or interest whatsoever to or in the said last mentioned Talooks or to or in either of them or any part thereof or that the said Talooks or either of them continued to be the joint property of the said Rameaunt Roy Juggomohun Roy and this defendant from the time of the purchase thereof at the Government sale as stated in the Complainants Bill, until or at the time of the death of the said Rameaunt Roy, as in the bill is untruly stated And this defendant further answering saith that the said Ramloohun

Roy was not nor did he become entitled to any part of any joint estate upon the death of the said Ramcaunt Roy in as much as there was not any joint estate upon or at the time of the death of the said Ramcaunt Roy And this defendant further answering saith that the said Ramlochun Roy from the time when he so proceeded to Radanagar as hereinbefore mentioned did not afterwards re-unite himself with the said Ramcaunt Roy Juggomohun Roy and this defendant or with any or with either of them and that the said Ramcaunt Roy this defendant and the said Juggomohun Roy or any of them from or after the time of the said partition did not at any time during the life time of the said Ramcaunt Roy re-unite or form an undivided family, but that on the contrary thereof the said Ramcaunt Roy shortly after the said partition, proceeded to reside in the said lodging house at Burdwan which he had so reserved for himself as aforesaid and continued during the remainder of his lifetime to reside and live apart and separate from this defendant and from the said Juggomohun Roy and that this defendant and the said Juggomohun Roy although they occasionally occupied portions of the same house and although their families were under the superintendance and management of the said Tarraney Dabey as aforesaid yet lived and conducted their affairs and concerns separately and unconnected with each other and did not at any time after the said partition re-unite or form an undivided Hindoo family as untruly stated in the Complainants Bill. And this defendant further answering saith that he this defendant or the said Ramlochun Roy to the knowledge or belief of this defendant did not claim to be entitled to any part of the estate immoveable and moveable or real and personal of which the said Ramcaunt Roy was possessed or entitled unto at the time of his death but that the said Juggomohun Roy preferred a certain claim as the sole heir of the said Ramcaunt Roy before the Zillah Court of Burdwan and also before the provincial Court of Appeal of Calcutta in order to obtain possession of certain property which had belonged to the said Ramcaunt Roy at the time of his death and that in default of other claimants the said Juggomohun Roy was recognized by the said Courts respectively as the sole heir of the said Ramcaunt Roy And this defendant further answering saith that upon the death of the said Ramcaunt Roy he this defendant and also the said Ramlochun Roy and Juggomohun Roy did as this defendant believes become entitled jointly to the estate immoveable or real and moveable or personal which was of the said Ramcaunt Roy at the time of his death But this defendant further answering denies that the said Ramcaunt Roy at the time of his death was seized and possessed of or otherwise entitled unto any estate immoveable or moveable jointly with this defendant and the said Juggomohun Roy or that this defendant and the said Juggomohun Roy either at the time of the death of the said Ramcaunt Roy or at any time afterwards became or were entitled unto or at any time possessed themselves of the whole or of any part of any estate immoveable or moveable, which had belonged to the said Ramcaunt Roy Juggomohun Roy And this defendant at the time of the death of the said Ramcaunt Roy. And this defendant further answering positively denies that at the time of the death of the said Ramcaunt Roy or at any time afterwards the said Talooks of Govindpore and Rammissorpore which in the Complainants Bill of Complaint are alleged to have yielded together, after payment of the Revenue to Government an annual income or profit to the Zamindar of Fifteen thousand Rupees or thereabouts were or was comprized in the real or immoveable estate whereof the said Ramcaunt Roy died seized or possessed or that the said Talooks or either of them were or was held in the name of Rajiblochan Roy upon the trust untruly stated in the Complainants Bill of Complaint for this defendant saith that the said Talooks and each of them before at and after the death of the said Ramcaunt Roy were and was the sole and exclusive property of this defendant as hereinbefore mentioned subject only to the conditional transfer herein before in that behalf mentioned

ক্রমশ

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

ছোটে সাহেব সেলাই বন্ধ ক'রে বললে, যা বলেছিস আহিয়া! লল্‌হিত আর সুদনের মতন ছেলে আর হয় না। জানো রায় সাহেব, শর্মাজী শুনো। বাবুজী তখন সরকারী চাকরি থেকে পেন্‌সিন নিয়ে বাঁন্‌স্ বেরিলিতে চাকরি নিয়েছেন। আমার উমর তখন দশ কি বারো, একদিন বাবুজীর সঙ্গে বাজারে জামা কিনতে বেরিয়েছি, দেখি দুটো বাংগালীর ছেলে, একেবারে নাদান্, আমারই হাম-উমর্ হবে, বিমর্ষ হয়ে রাস্তার ধারে ব'সে রয়েছে। বেরিলিতে যত বাংগালীর ঘর আছে তাদের সবাই আমাদের চেনা, এরা তাদের কেউ নয়। বাবুজী জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ি কোথায়? তারা কাঁদতে কাঁদতে ব'লে ফেললে যে, তারা ঘরসে ভেগে পচ্ছিম চ'লে এসে এমন মুশকিলে ফেঁসে গেছে। সাবাস বাংগালী, দশ বছরের ছেলে বাবা ঘরসে

ভেগেছে! বাবুজী তাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসে একেবারে আমার মায়ের জিম্মে ক'রে দিলে।

সেই থেকে তারা আমাদের ঘরেরই ছেলে হয়ে গেল, আর বাড়ি ফিরলে না। একই বয়সী কিনা তাই আমার সঙ্গে তাদের এমন ভাব হয়ে গেল যে, লোকে মনে করত, আমরা বুঝি সব মায়ের পেটের ভাই। আমার মায়ের তো লল্‌হিত ছাড়া এক লম্‌হাও চলত না। বহেনজী তখন ছিল শ্বশুরাল, আমার বড়ে ভাই বিয়ে করে নি, মার সেবা করবার কেউ নেই। লল্‌হিত মার খুব সেবা করত। রোজ সন্‌ধের সময় দু ঘণ্টা ক'রে মার গোড় দাবানো, এখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া, লল্‌হিত ছাড়া মার আর একদণ্ডও চলে না।

এই রকম প্রায় দশ বছর কেটে যাওয়ার পর সেবারে বেরিলিতে ভারি চেচক্ শুরু হয়ে গেল। কোথা থেকে লল্‌হিত বেচারা চেচক্ নিয়ে এল। বাবুজী শহরের সেরা সেরা ডাক্তার দেখালে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। বেচারার চোখ দুটো আগেই নষ্ট হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, মা, আমার চোখই যখন নষ্ট হয়ে গেল, তখন আর বেঁচে লাভ কি? মা তাকে বোঝাতে লাগল, যতক্ষণ আমার চোখ আছে বেটা, ততক্ষণ তোর ভাবনা কি? আমি, গেলে ছোটকা রইল, স্থদন রইল, তারা তোকে দেখবে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। দু মাস ভুগে লল্‌হিত বেচারা চ'লে গেল, আমার মায়ের কোলেই মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমার মা তো বেহোঁশ হয়ে সেই মুর্দা জড়িয়ে ধ'রে প'ড়ে রইল, শেষকালে বাবুজী এসে তাকে ছাড়িয়ে নিলে। মা যে সেই পাশ ফিরলে সাত দিন আর উঠল না। শেষকালে আমার এই আহিয়া, এই মেয়েমানুষটা, তাকে তুলে নাওয়ালে খাওয়ালে।

এতখানি এক নাগাড়ে ব'লে ছোটে সাহেব একটু দম নিয়ে বৃদ্ধার উদ্দেশে বললে, আহিয়া, তুম্‌হে ইয়াদ্ হ্যয় উও সব বাতেঁ?

আহিয়া গজগজ ক'রে কি বললে, বুঝতে পারলুম না।

পরিতোষ জিজ্ঞাস করলে, স্থদন কোথায়?

ছোটে সাহেব সেলাই থামিয়ে তার দিকে চেয়ে বলতে আরম্ভ করলে, আরে ভাইয়া, তার আসল নাম হচ্ছে মদ্‌স্থদন। আমার মা তাকে স্থদন ব'লে ডাকতেন। সেই থেকে মদ্‌স্থদন স্থদন হয়ে গেছে। লল্‌হিত মারা যাবার

পর বাবুজী স্থদনের চাকরি ক'রে দিলেন মিউনিসিপ্যালিটিতে, বাইশ টাকা মাইনেতে। সে বেচারী মাইনের সব টাকা এনে আমার মায়ের হাতে দিত। এই রকম বছরখানেক যেতে না যেতেই লল্‌হিত আমার মাকেও টেনে নিলে। মাও ওই চেচকেই ম'রে গেল।

এতক্ষণে ছোটে সাহেবের কণ্ঠে একটু যেন অশ্রুর আমেজ পাওয়া যেতে লাগল। সে ব'লে চলল, মা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাবুজী ওখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কাশীতে চ'লে এলেন। স্থদন ওইখানেই র'য়ে গেল, আজ সে আশি টাকা তন্‌খোয়া পায়। স্থদন বেচারা বড় ভাল। আগে পূজো ও বড়দিনের ছুটিতে দুবার ক'রে বাড়ি আসত, কিন্তু আমার অসুখ বাড়ার খবর পেয়ে আজকাল দু-তিন মাস অন্তরই একবার দুবার ক'রে এসে আমাকে দেখে যায়। সে তো চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে চ'লে আসতে চায়, কিন্তু বাবুজী আর দিদিমণি তাকে চাকরি ছাড়তে দেয় না। স্থদন যতদিন এখানে থাকে, ততদিন বেশ ফুর্তিতেই দিন কাটে, এই তো দিন পনেরো আগে সে গেছে।

ছোটে সাহেব আবার কিছুক্ষণের জন্যে চুপ ক'রে বোঁ-বোঁ ক'রে সেলাই ক'রে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ একবার মুখ তুলে বললে, আমি এবার স্থদনকে ব'লে দিয়েছি, ভাইয়া, এবারে লল্‌হিত আমাকেও টেনেছে, কবে নিয়ে যাবে সেই আশায় ব'সে আছি। আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

দেখতে দেখতে ছোটে সাহেবের চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠল, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলুম যে, সেই দুর্বলতাকে দমন করবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। হঠাৎ ছোটে সাহেব ঘাড় নীচু ক'রে আবার সেলাইয়ে মন দিলে।

মানুষের জীবনে অথবা মানুষের মনে প্রেম ও শোক এই দুটি অনুভূতিই প্রধান। প্রেমের মতন শোকও অজানা অপরিচিতকে আপনার করে, দূরকে নিকটে টেনে নিয়ে আসে, আত্মীয়কে পরমাত্মীয় ক'রে তোলে। শোকাশ্রুই পলাতকা অতীতকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে বর্তমানের বাহুবন্ধনে। আজ সকালে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম ক'রে যখন উঠে বসেছিলুম, তখন এই পরিবারের সুখদুঃখ তো দূরের কথা, তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোনও জ্ঞানই আমার ছিল না। এই মৃত্যুপথযাত্রী পঙ্গু যুবকের মুখের কয়েকটি কথা আর ওই বৃদ্ধার কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল তাদের সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য বন্ধনে

বেঁধে ফেললে। কে কোথাকার লল্‌হিত আর সুদন, যাদের কখনও চোখেও দেখি নি, তারা হয়ে উঠল আমাদের জীবনবন্ধু। চোখের সামনে যেন দেখতে লাগলুম, আমাদেরই মতন দুটি অসহায় বালক পথের ধারে বিষণ্ণ মুখে ব'সে আছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ভবিষ্যতের অন্নবস্ত্রের চিন্তায় যখন তারা দিশাহারা, সেই সময় অতি অপ্রত্যাশিতভাবে দেবদূতের মতন এসে এই সংসারের কর্তা তাদের তুলে নিয়ে এলেন নিজের গৃহে, সেই থেকে এই গৃহই তাদের আপন হয়ে গেল। এদের দুঃখসুখের সঙ্গেই তাদের জীবনসূত্র জড়িয়ে গেল চিরদিনের জন্যে।

বেলা বেড়েই চলল। আমরা দুটিতে চুপ ক'রে ব'সে আছি আর ভাবছি, লোকটা যে থাকতে বললে, কিন্তু সে সম্বন্ধে আর কোনও কথাই বলছে না তো! বুড়ীও কোন কথা কয় না। সেও কলের মতন ছোটে সাহেবের পিঠে হাত বুলিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে ঢুলে তার মাথাটা ছোটে সাহেবের পিঠে গিয়ে ঠেকছে, কিন্তু সে নির্বিকার, বোঁ-বোঁ ক'রে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে চলেছে, মাঝে মাঝে ছুঁচের গর্তে সুতো ভ'রে নিয়ে আবার সেলাই শুরু করছে।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেক এই ভাবে চুপচাপ কাটবার পর ছোটে সাহেব বুড়ীর দিকে ফিরে তার কানে কানে কি বললে, শুনতে পেলুম না।

বৃদ্ধা ধীরে-সুস্থে খাট থেকে নেমে গেলাসটা তুলে নিয়ে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কি নিয়ে গজগজ করতে করতে নীচে নেমে গেল।

ছোটে সাহেব আমাদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল, তার বাবার কাশীতে মস্ত ডিস্‌পেন্‌সারি, ওখানকার যত রইস আছে প্রায় সবার বাড়িরই তিনি গৃহ-চিকিৎসক, কাশী-নরেশের বাড়ি থেকেও তাঁর ডাক আসে। সব জায়গা থেকেই মাসোহারা পান, এতেই তাঁর প্রায় পাঁচশো টাকা আমদানি আছে, এ ছাড়া কাশীর সিক্‌রোলে বড় বাড়ি আছে, নীচে বড় দাওয়াখানা, সকাল সন্ধ্যেয় প্রায় দু-তিনশো রুগী আসে, তাদের ওষুধ বিক্রি ক'রেও দৈনিক প্রায় শতখানেক টাকা রোজগার আছে। সে ব্যবসা বড়ো ভাই দেখে; বাবুজী তা থেকে কিছুই পায় না, সে-ই সব মেরে দেয়। মাঝে মাঝে বহেনজী হাঙ্গামা-হুজ্জৎ ক'রে তার কাছ থেকে সংসার-খরচ বাবদ দু-পাঁচশো টাকা আদায় ক'রে নেয়। আমার ভাইটা হচ্ছে বদমাইস। সব টাকা মাগী, ইয়ার আর সরাবেই ফুঁকে দেয়। বাবুজী একেবারে শিবের মতন, সে তো কিছু বলে না; কিন্তু বহেন্‌জী

হচ্ছে একেবারে পাহ্‌লোয়ান, বড়ে ভাইয়ের মতন দশটা মরদকে সে গায়ের জোরেই ঠাণ্ডা ক'রে দিতে পারে। দাওয়াখানার হিসাবপত্তর সব বহেন্‌জী দেখে, এই নিয়ে হর্‌হপ্তা ঘরে ভাইবোনে খুনোখুনি চলতে থাকে।

কিছুক্ষণ আবার সেলাই-ফোঁড়াই চলবার পর ছোটে সাহেব মুখ তুলে বললেন, বহেন্‌জীর নিজের টাকার অভাব নেই, সে আমার জন্যেই ভাইয়ার সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করে। বেচারা তো জানে না যে, আমার দিন খতম হয়ে এসেছে।

এবার আমি বললুম, আপনি বৃথাই ভয় পাচ্ছেন। আপনি ঠিক সেরে উঠবেন।

ছোটে সাহেব একটু হেসে সেলাইটা এক পাশে রেখে ডান পায়ের আচ্ছাদনটা তুলে বললে, এ পা-টা দেখছ?

তারপরে বাঁ পা-টা দেখিয়ে বললে, এই পা-টাও এমনিই ছিল, এখন দুটোতে তফাৎ দেখ।

দেখলুম, দুটো পায়ে আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে গিয়েছে, তবুও তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, এ পা-টাও সারবে, তবে পা-টা পঙ্গু হয়ে যাবে।

ছোটে সাহেব হেসে সেলাইটা তুলে নিয়ে বললে, শর্মাজী, তোমরা ছেলেমানুষ। আমার চাইতে কম আজ্ কম দশ-পনেরো বছরের ছোট হবে, তোমরা কি জান?

আমাদের কথাবার্তা চলেছে, এমন সময় একটা লোক দু হাতে দু থালা জলখাবার নিয়ে এসে আমাদের সামনে রেখে দিয়ে চ'লে গেল। ছোটে সাহেব বললেন, নাও রায় সাহেব, শর্মাজী, কিছু জল খেয়ে নাও। এ-বেলা তো ভাত-টাত কিছুই হ'ল না।

বিশেষ অনুরোধ আর করতে হ'ল না। বেলা তখন দ্বিপ্রহর—ক্ষুধাও বেশ চন্‌চনে হয়েছিল। দেখতে না দেখতে থালা সাফ হয়ে গেল। যে লোকটা খাবার দিয়ে গিয়েছিল, সে-ই একটা গেলাস ও একটা জলভরা ঘটি নিয়ে এসে আমাদের জল খাইয়ে গেল।

একটু পরে ছোটে সাহেব আমাদের বললে, কি, বিড়ি-টিড়ি ফোঁকা অভ্যেস আছে নাকি?

বললুম, অভ্যেস না থাকলেও মাঝে মাঝে ফুঁকে থাকি—আপত্তি কিছুই নেই।

আমাদের কথা শুনে সে কিছুক্ষণ পেছনের তাকিয়ার ওপর শুয়ে নির্বিকার হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। তারপরে উঠে পাশের সেই লম্বা বাঁশের লাঠিটার ওপর ভর ক'রে দাঁড়াল। দেখলুম, তার সেই পঙ্গু দোমড়ানো পা-খানা জমি থেকে বোধ হয় হাতখানেক উঁচুতে নড়বড় ক'রে ঝুলতে লাগল। ডান হাত দিয়ে সেই পা-খানা লাঠির চারিদিকে এক ফের কি দু ফের ঘুরিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে নেংচে নেংচে ছাদের এক কোণের ঘেরা বারান্দা দিয়ে বোধ হয় বাড়ির ভেতরে চ'লে গেল। কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর পরিতোষ বললে, সরাইওয়ালাকে যে মাংস কেনবার জন্যে পয়সা দিয়ে আসা গেল, তার কি হবে?

দেখা যাক কি হয়! বরাতে মাংস খাওয়া আজ নেই ব'লেই তো মনে হচ্ছে।

কথাবার্তা চলছে, এমন সময় ছোটে সাহেব সেই রকম লাঠির ওপরে ভর দিয়ে করুণ কাতরধ্বনি করতে করতে ফিরে এল, হাতে তার এক বাণ্ডিল বিড়ি।

বিড়ির বাণ্ডিলটা আমার হাতে দিয়ে বললে, নাও শর্মাজী, পিও।

তারপরে তেমনই কাতরাতে কাতরাতে খাটের ওপর গিয়ে ব'সে পড়ল। আমরা দুজনে দুটো বিড়ি ধরিয়ে মোক্ষম টান মেরে কাশতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। ছোটে সাহেব আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সহাস্য বদনে বললে, কি, খুব কড়া বুঝি?

কাশতে কাশতেই বললুম, না, অনেকদিন টানি নি কিনা, তাই কাশি হচ্ছে।

বাণ্ডিলটা তোমাদের কাছেই রেখে দাও, ফুরিয়ে গেলে আমাকে ব'লো।

এই ব'লে সে তাকিয়ায় হেলান দিলে। কিছুক্ষণ সেই ভাবে থেকে বললে, শর্মাজী, একটু লেট্‌ছি ভাই, কিছু মনে ক'রো না, এই মিনিট পাঁচেক, চ'লে যেও না যেন।

বললুম, না না, মনে করব কি! আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন।

ছোটে সাহেব বালিশে মাথা দিয়ে চোখ বুজে ফেললে। আমরা দুটিতে ব'সে ব'সে বিড়ি ফুঁকতে লাগলুম। অনেকদিন পরে ধোঁয়ার আস্বাদ পেয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বোধ হয় গোটা-পঁচিশেক বিড়ি শেষ ক'রে ফেললুম। বিড়ি ফুঁকছি আর অদৃষ্ট এবার আমাদের কি নতুন প্যাঁচ মারলে তারই গবেষণা চলেছে। দেখতে দেখতে ছাতের এক পাশ থেকে রোদ গড়াতে গড়াতে রাস্তায় নেমে পড়ল। ছোটে সাহেব তেমনই প'ড়ে আছে খাটের ওপরে, চোখ বুজে একপাশ ফিরে কুঁকড়ে-শুঁকড়ে। একবার উঠে গিয়ে তার কপালে হাত দিয়ে দেখলুম, আগুন গরম—বোধ হয় একশো চার ডিগ্রী জ্বর হবে। কপালে হাত দেওয়া মাত্র ধরা গলায় সে বললে, আহিয়া!

হাত সরিয়ে নিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসলুম। কি করব তাই পরামর্শ করতে লাগলুম।

পরিতোষ বললে, চল্, সরাইয়ে ফিরে যাই। কিন্তু ভদ্রলোক বার বার অনুরোধ ও মিনতি ক'রে বলেছে তার কাছে থাকবার জন্যে, এই সব আলোচনা চলছে এমন সময় ওবেলাকার সেই বৃদ্ধা আবার একটা গেলাস হাতে নিয়ে ছাতে এসে উপস্থিত হ'ল।

বৃদ্ধা খাটের কাছে গিয়ে বেশ উচ্চৈঃস্বরে হাঁক ছাড়লে, আরে ছোটে!

ছোটে সাহেব চমকে চোখ চেয়ে বললে, আহিয়া, আয়ি তুম্?

তারপরে ক্যাঁকাতে ক্যাঁকাতে উঠে ব'সে বৃদ্ধার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে এক চুমুকে সেটা নিঃশেষ ক'রে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললে, শঙ্কর আর ভরতকে পাঠিয়ে দে, আমাকে ঘরে নিয়ে যাবে।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলে, তাপ এসেছে বুঝি?

ছোটে সাহেব চোখ বুজেই বললে, ওঃ, বড়ি তকলিফ্।

বৃদ্ধা সিঁড়ির দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল। ছোটে সাহেব তাকে ডাক দিলে, আহিয়া, শুন্।

বৃদ্ধা কাছে আসতে সে আমাদের দেখিয়ে বললে, এদের কথা বহেন্‌কে বলেছিস? সারাদিন যে এদের খাওয়া-দাওয়া হ'ল না, সেই সকাল থেকে ব'সে আছে বেচারারা—

ছোটে সাহেবের কথা শুনে বুড়ী একেবারে চীৎকার ক'রে উঠল, হায় রামা! আমাকে কি তুই কিছু বলেছিস? সে মাগী শুনলে তো আমার জান খেয়ে ফেলবে। বলবে, মেহ্‌মানদের এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছিস! হায় রামা! অনেক তো দেখালি, আর কেন, এবার আমাকে টেনে নে। বলতে বলতে বুড়ী দেওয়ালে ঢকাঢক্ মাথা কুটতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

বুড়ী আরও হাঙ্গামা লাগাবার উপক্রম করছিল, এমন সময় ছোটে সাহেব চেঁচিয়ে উঠল, হারামজাদী—নিগোড়ে! আমাকে না খেয়ে কি তুই মরবি?

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তো শেষ ক'রে এনেছিস। যে কটা দিন আছি, একটু শান্তি দে।

কথাগুলো শুনে বুড়ী একেবারে চুপ হয়ে গেল। ছোটে সাহেব বললেন, যা, বহেন্‌জীকে বলগে যা, আমি ব'লে দেব, সে কিচ্ছু বলবে না তোকে।

বুড়ী আর কোন কথা না ব'লে কাঁপতে কাঁপতে নীচে নেমে গেল। ছোটে সাহেব আমাদের দিকে ফিরলে, দেখলুম, তার চোখ দুটো রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে। একটুখানি হাসবার চেষ্টা ক'রে সে বললে, আজকের তাপটা খুবই চড়েছে ব'লে মনে হচ্ছে। একটুখানি লেট্‌ব মনে ক'রে একেবারে শুয়ে পড়েছিলুম, কিছু মনে ক'রো না ভাই, তোমাদের বড় তক্‌লিফ হ'ল। কাল থেকে আর এমন হবে না।

আমি বললুম, না না, আমাদের কোন তক্‌লিফ হয় নি। আপনি কেন এসব কথা বলছেন?

ছোটে সাহেব বললে, না ভাই, তোমাদের রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে এসে এখানে বসিয়ে আমি শুয়ে পড়লুম। কি বলব, আমায় মাপ ক'রো ভাইয়া, বড় কসুর হয়ে গেল আমার।

এতদিন পরে এই জাতক লেখার তাড়নায় সেই সুপ্ত স্মৃতিকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে জাগিয়ে তুলছি আর মনে হচ্ছে, সে-দিনের সঙ্গে আজকের দিনের কত তফাৎ হয়ে গিয়েছে। আজ ভারতবাসী পূর্ণস্বাধীনতা-প্রয়াসী, অর্থে সামর্থ্যে আজ তারা অনেক উন্নত, অনেক সমৃদ্ধ। কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার—সেদিক দিয়ে যে তারা কত দরিদ্র হয়ে পড়েছে, তা আমার মত অভিজ্ঞতা যার আছে সেই জানে।

ছোটে সাহেবের কথা শুনে আমাদের চোখে জল এসে গেল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তাকে বললুম, আপনি আমাদের এত উপকার করলেন আর আপনার নামটি পর্যন্ত আমরা জানতে পারলুম না।

ছোটে সাহেব বললে, আরে, আমার নাম বিশ্বনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়, আমার ভাইয়ের নাম শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়, আমাদের ঠাকুরের নাম ডাঃ শিবনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়। তোমরা আমার ছোট ভাইয়ের মতন। আমাকে বিশুদা ব'লে ডেকো।

এতখানি ব'লেই সে আবার বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজে ফেললে।

ব'সে আছি তো ব'সেই আছি। দেখতে দেখতে রোদ প'ড়ে যেতে লাগল। ব্যাপারটা রাজকুমারীর বাড়ির চেয়েও রহস্যজনক হয়ে উঠছে দেখে আমরা ঠিক করলুম, আর কিছুক্ষণ দেখে আস্তে আস্তে নেমে চ'লে যাব। এমন সময় দুজন ষণ্ডা-ষণ্ডা চাকর ছাতে এসে উপস্থিত হ'ল। ছোটে সাহেব চোখ বুজে অজ্ঞানের মতন প'ড়ে ছিল, তাদের সাড়া পেয়ে সে চোখ চেয়ে বিজ্‌বিজ ক'রে কি বললে! তারপর তারা তাকে চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিয়ে চ'লে গেল। যাবার সময় ছোটে সাহেব বললেন, আমি ঘরে শুতে যাচ্ছি, তোমরা চ'লে যেও না যেন।

বিশুদা চ'লে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কেটে গেল। আমরা উঠি উঠি করছি, এমন সময় আহিয়া এসে বললে, চল, তোমাদের ভেতরে ডাকছে।

আবার সেই মইয়ের মতন সোজা সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটা সরু গলিপথ দিয়ে আমরা বাড়ির ভেতরে চললুম। প্রকাণ্ড একটা উঠোন, উঠোনের এক কোণে তিনটে মূলতানী গাই বাঁধা রয়েছে—এমন সুন্দর গরু কলকাতার লোকের চোখে কমই পড়ে। সেই উঠোন পেরিয়ে আবার একটা আধা-অন্ধকার লম্বা গলিপথ পার হয়ে দালান। সেই দালানের এক কোণ দিয়ে সিঁড়ি। অপেক্ষাকৃত চওড়া হ'লেও প্রায় সেই মইয়েরই মতন সোজা। সেই সিঁড়ি প্রায় হামাগুড়ি মেরে অতিক্রম ক'রে ওপরে একটা বড় দালানে পৌঁছলুম। দালানের গায়ে এক সারে পাশাপাশি তিন-চারটে ঘর। বৃদ্ধা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে আমাদের বললে, এই যে, এদিকে এস। আমরা, আমি আগে আর পেছনে পুঁটলি-বগলে পরিতোষ, অতি সঙ্কোচের সঙ্গে পা পা ক'রে সেই ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম, ঘরের মধ্যিখানে আমাদের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে একটি নারী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সদ্যোস্নাতা, মাথার মাঝখানে চূড়োর মতন উঁচু ক'রে চুল বাঁধা। একখানা ধপ্‌ধপে সাদা পাতলা ফিন্‌ফিনে থান পরা। তার ভেতর দিয়ে দেহের প্রায় সবই দেখা যাচ্ছে। বয়স কুড়ি থেকে ত্রিশের কোন একটা জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দেহলতা, দাঁড়াবার ভঙ্গী, চোখের দৃষ্টি ও মাথার সেই চূড়ো মিলিয়ে একটি নিষ্কম্প দীপশিখার সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। বার-বাড়ির সেই পঙ্গু, ভগ্নস্বাস্থ্য যুবকের যেন এটা উলটো পিঠ। এ রকম উদ্ধত যৌবনশ্রী এর আগে আর আমার চোখে পড়ে নি।

মিনিটখানেক আমাদের দিকে সেই ভাবে চেয়ে থেকে তিনি বললেন, খুব কষ্ট হয়েছে তো? ছোটটার কোনও আক্কেল নেই। সারাদিন নিজের কাছে বসিয়ে রেখে গাল-গপ্প করলে আর বাড়ির ভেতর একটা খবর পর্যন্ত পাঠালে না! সারাটা দিন খাওয়া হয় নি তো?

আমি বললুম, না, আমাদের কষ্ট কিছুই হয় নি। সকালবেলা খেয়েই বেরিয়েছিলুম। দুপুরে তো আপনি খাবার পাঠিয়েছিলেন, তাই খেয়েছি।

জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি?

নাম বললুম। পরিতোষের নাম শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জাত?

পরিতোষ বললে, আমরা কায়স্থ।

তিনি বললেন, আমাদের সুদনও কায়স্থ। তোমাদের সঙ্গে কিছুই নেই বোধ হয়?

তারপরে মৃদু হেসে বললেন, পালাবার সময় কে আর জিনিসপত্র নিয়ে পালায়! কি বল?

পরিতোষটা এতক্ষণ আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। স্ত্রীলোকের সামনে এলে অতিশয় লজ্জিত হয়ে পড়াই ছিল তার স্বভাব। হঠাৎ তার মনে যে কি অনুপ্রেরণা এল বুঝতে পারলুম না, সড়াক ক'রে এগিয়ে এসে তাঁকে একটা প্রণাম ক'রে ফেললে। তার দেখাদেখি আমিও একটা প্রণাম করলুম। প্রণামের পালা শেষ হবার পর তিনি হেসে বললেন, আমাকে কি ব'লে ডাকবে?

'মাসী' বলব, কি 'দিদি' বলব, এই নিয়ে মনের মধ্যে জল্পনা চলছে, এমন সময় তিনি নিজেই তার সমাধান ক'রে দিয়ে বললেন, আমাকে 'দিদিমণি' ব'লে ডাকবে, কেমন?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম।

দিদিমণির কথাবার্তার মধ্যে পশ্চিমী সুরের একটু আমেজ থাকলেও বিশুদাদার মতন তিন ভাগ উর্দু নেই। কথাবার্তা ও হালচালের মধ্যে শুদ্ধ বাঙালী-ঘরেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

এবার তিনি বৃদ্ধাকে ডেকে ঠেট্-হিন্দীতে বলতে লাগলেন, বড়ে ভাইয়ের ঘরে এদের দুটো নতুন বিছানা পেতে দাও। অমুক জায়গা থেকে নতুন

বালিশ নেবে, অমুক স্থানে যে-সব তোষক আছে তা থেকে নিও না, অমুক ঘরে কাঠের সিন্দুকে বালিশের ওয়াড় ও বিছানার চাদর আছে, ইত্যাদি।

বৃদ্ধার প্রতি বক্তব্য শেষ ক'রে আমাদের বললেন, আমার বড়ে ভাইয়ের ঘরে তোমাদের শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। বাড়িতে ঘরের অভাব নেই, তবে সব ঘরই আসবাব-জিনিসপত্রে ঠাসা। একটা ঘরের জিনিসপত্র সরিয়ে দিয়ে তোমাদের ঘর ক'রে দেব। কয়েকটা দিন এখন ওই ঘরেই থাক। আমার দাদা প্রায় কাশীতেই থাকে। সপ্তাহে একদিন কি দুদিনের বেশি বাড়ি আসে না, কোনও অসুবিধা হবে না তোমাদের।

আহিয়া চ'লে গেল আমাদের বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করতে। দিদিমণি দালানে একখানা শতরঞ্চি পেতে আমাদের নিয়ে ব'সে বাড়ির কথা, কেন বাড়ি থেকে পালিয়েছি, পালিয়ে কতদিন কোথায় ছিলুম ইত্যাদি সব কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। দিদিমণি বললেন, তাঁর বাবা সেই ভোরের ট্রেনে চ'লে যান কাশীতে শুধু এক লোটা দুধ খেয়ে। সকাল-সন্ধ্যে সেখানেই খাবার ব্যবস্থা আছে। বাড়ি ফেরেন রাত্রি দশটার ট্রেনে, স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরতে প্রায় সাড়ে দশটা বেজে যায়। আজ যদি তোমরা ঘুমিয়ে পড়, তা হ'লে আর তুলব না, কাল ভোরবেলা তুলে দেব বাবুজীর সঙ্গে দেখা করবে। না হ'লে বাবুজী রবিবারে বাড়িতে থাকেন, সেইদিন দেখা হবে।

আমি বললুম, আমাদের ভোরবেলাতেই তুলে দেবেন।

দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্তিরে রুটি খেতে কোন অসুবিধা হবে না তো?

কিছু না।

আচ্ছা, চল, তোমাদের ঘরে যাই।—ব'লে দিদিমণি উঠে ঘরের মধ্যে ঢুকে একখানা ধপধপে সাদা শাল গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপরে সেই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে এ গলি-সে গলি, উঁচু নীচু পথ দিয়ে আমাদের একটা বড় ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরের মেঝেতে এক দিকে একটা দুজনের মতন বড় বিছানা আর এক দিকে একজনের মতন একটা বিছানা পাতা। ঘরের মধ্যে ঢুকে সেই বড় বিছানাটা দেখিয়ে আমাদের তিনি বললেন, ওইটে তোমাদের বিছানা, এটা দাদার বিছানা।

ঘরের দেওয়ালে খুব উজ্জ্বল একটা দেওয়াল-গিরি জ্বলছিল। দেখলুম, এ

বাড়িতে রেড়ির তেলের কারবার একেবারেই নেই। ঘরের আর এক দেওয়ালে ছোট্ট চৌকো একখানা আয়না ঝোলানো রয়েছে। আর এক দিকে ঘরের মেঝেয় একটা বড় কাঠের সিন্দুক, এ ছাড়া ঘরে আসবাব আর কিছুই নেই।

দিদিমণি হেসে পরিতোষকে বললেন, তোমার সম্পত্তি ওই সিন্দুকের ওপর রেখে দাও, ভয় নেই, কেউ নেবে না।

পরিতোষ লজ্জিত হয়ে সিন্দুকের ওপরে আমাদের পুঁটলিটা রেখে দিলে। দিদিমণি বললেন, আচ্ছা, এবার চল, আমার ঘর দেখবে।

আবার তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, চারদিক ঘোর অন্ধকার, আমরা এক রকম হাতড়ে হাতড়ে চলেছি তাঁকে অনুসরণ ক'রে। এই ঘরের পরেই অন্ধকার ছাত, তারই মাঝামাঝি রেলের গুমটির মতন একটা চোরা-কুঠুরি-গোছের ঘর। তারই কয়েক গজ দূরেই একটা প্রকাণ্ড চার-জানলাওয়ালা হল-ঘরে দিদিমণি আমাদের নিয়ে এলেন। ঘরের এক দিক জুড়ে প্রকাণ্ড একটা পালং, বোধ হয় চার-পাঁচটা জোয়ান তাতে গড়িয়ে গড়িয়ে শুতে পারে। পালঙের ওপরে চমৎকার বাহারী মশারি—মশারি যে এত সুন্দর ও বাহারী হতে পারে তা এই প্রথম দেখলুম। ঘরের চার ধারে সুন্দর ও সুদৃশ্য ছোট-বড় দেরাজ, আলমারি; লোহার সিন্দুকই বোধ হয় তিন-চারটে। এই ঘরে নিয়ে এসে দিদিমণি বললেন, এইটে আমার ঘর।

তারপরে একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, কেমন সাজানো! পছন্দ হয়?

বললুম, চমৎকার!

ঘরের এক কোণে একটা উর্দি-পরা ষণ্ডা-গোছের চাকর টুলের ওপরে ব'সে ছিল। আমাদের ঢুকতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। দিদিমণি এবার তাকে হিন্দীতে কি ব'লে আমাদের বললেন, লোকটা সারাদিন এই ঘরে পাহারা দেয়। রাত্রিবেলা আর একটা লোক ওই চোরা-কুঠুরিতে শুয়ে থাকে পাহারা দেবার জন্যে।

তারপরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বললেন, ঘরে অনেক দামী জিনিস আছে কিনা! আমি তো সারাদিন অন্য ঘরে থাকি, রাত্রে বাবুজীকে ঘুম পাড়িয়ে ঘরে ফিরতে রাত্রি প্রায় বারোটা বেজে যায়, ততক্ষণ এরা পাহারা দেয়। আমি ঘরে এলে পাহারা চ'লে যায় চোরা-কুঠুরিতে, সকালে আবার পাহার বদলি হয়। রাতে আমার ঘরে আহিয়া শোয়।

দিদিমণির খাটের পাশেই দেখলুম, একটা স্ট্যাণ্ডে দুটো দো-নলা বন্দুক সাজানো রয়েছে। বললুম, দিদিমণির কি শিকার করা অভ্যেস আছে নাকি? বিছানার পাশেই বন্দুক কিসের জন্যে?

দিদিমণি বললেন, আরে ভাই, শিকার-খেলার অভ্যেস তো খুবই ছিল এককালে, নিশানাও ছিল খুব ঠিক, কিন্তু সে-সব এখন চুকেবুকে গেছে। ও দুটো আছে মানুষ শিকারের জন্যে। এখানে ডাকাতের ভয় আছে কিনা, যদি দরকার হয় তাই রাখা।

আবার সেই লোকটাকে কি ব'লে দিদিমণি বললেন, চল, এবার ছোটকার কাছে যাই।

সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আবার খানিকটা ছাত, তারপরে আর একটা চোরা-কুঠুরি, তারপরেই বিশুদার ঘর। বিশুদার ঘরের কাছাকাছি পৌঁছেই শুনতে পাওয়া গেল, ঘরের ভেতরে খুব মজলিস চলেছে। ঘরের দরজায় একটা লোক ব'সে ছিল, দিদিমণিকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল। দিদিমণি তাকে বললেন, শঙ্কর, ছোটে সাহেবকে বল আমি এসেছি।

এই ব'লেই তিনি পাশের চোর-কুঠুরিতে ঢুকে আত্মগোপন করলেন, শঙ্কর ভেতরে চ'লে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই ঘর থেকে দশ-বারোটা লোক হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে ছাতের এক কোণের একটা গলিপথ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বোধ হয় সেই ছাতে যেখানে সকালে আমরা এসে বসেছিলুম। লোকগুলো বেরিয়ে যাবার পর শঙ্কর চোর-কুঠুরির সামনে গিয়ে কি বলতেই দিদিমণি বেরিয়ে এসে আমাদের বললেন, এস।

বিশুদার ঘরে ঢুকলুম। ঘরখানা প্রায় দিদিমণির ঘরের মতনই বড়। মেঝেতে ঘর-জোড়া বিছানা। দু দিকের দেওয়ালে দুটো উজ্জ্বল কেরোসিনের বাতি জ্বলছে, ঘর একেবারে ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। চারিদিকে, এমন কি বিছানার ওপরে পর্যন্ত, বিড়ির টুকরো আর দেশলাইয়ের কাঠি। দুটো তিনটে সটকার মাথায় কলকের ওপরে তখনো গন্‌গন ক'রে ছোট ছোট গুল জ্বলছে। বিছানার এক কোণে একটা উঁচু গদির ওপর আধশোয়াভাবে পিঠে বালিশ দিয়ে বিশুদা ব'সে আছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দিদিমণি সেই বিছানার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে বিশুদাকে একরকম জড়িয়ে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে, ভাইয়া, কেমন আছিস ?

ভাই-বোনের সম্বন্ধ একেবারে বাঙালী ঘরের মতন হ'লেও উর্দুতে কথাবার্তা শুরু হ'ল। দিদিমণি বলতে লাগল, ছোটে, তুই কেন কিছু খাচ্ছিস না ? এমন ক'রে কদিন বাঁচবি ভাই ? বাবুজী বলে, দুধ আর গোশ্তের সোরুবা না খেলে তুই বাঁচবি না। খাওয়া-দাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলি কেন ?

বিশুদা বলতে লাগল, বহেন্, খেতে যে পারি না ভাই। তুই বুঝছিস না, তুই তো কিছুতেই মানবি না, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার দিন প্রায় শেষ হয়ে এল। সারাদিন বাদে তুই এলি—কোন্‌দিন এসে দেখবি তোর ছোটে আখ্‌রি শ্বাঁস ছেড়েছে।

পাঁচ মিনিট আগে এই ঘরে হাসির হর্‌রা চলছিল, আমরা নিজের কানে শুনেছি।

দেখতে দেখতে দিদিমণির চোখে অশ্রু দেখা দিল। অত্যন্ত ধরা গলায় করুণ কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, ছোটে, তুই চ'লে গেলে আমি কি নিয়ে থাকব ভাই—আমার কি রইল ?

দিদিমণির অশ্রু ও করুণ কণ্ঠের চাইতে করুণতর হাসি হেসে বিশুদা বললে, বহেন্, পরমাত্মার দয়ার সীমা নেই। দেখ্, আমি চ'লে যাবার আগেই সে তোকে এই দুটো ভাই এনে জুটিয়ে দিয়েছে।

আমরা দিদিমণির দু পাশে—একটু পেছনে ব'সে ছিলুম। বিশুদা কথাটা বলামাত্র দিদিমণি একবার পাশ ফিরে আমাদের দেখে আবার ভাইয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

ছোটে সাহেব বলতে লাগল, এই শর্মাজী ও রায় সাহেব—এরা তো এখনও বাচ্চা, তুই এদের নিজের মতন তৈরি ক'রে নে। এদের মুখ দেখেই বুঝতে পারা যায়, এরা শরীফ ঘরের ছেলে।

তারপরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে, আর সুদন তো রইল—আমি গেলে তাকে আর চাকরি করতে দিস নে, কাছে এনে রাখিস।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। তারপরে বিশুদা আমাকে ডেকে তার অদ্ভুত বাংলা ভাষায় বললে, দেখো শর্মাজী, আমার দিদিমণিকে তোমরা দেখো। বেচারা বড় দুঃখীলোক আছে, ওর সাথ কখনও ছেড়ো না।

এই অবধি ব'লেই বিশুদা একদৃষ্টে সামনের দিকে চেয়ে রইল। দিদিমণি বাঁ হাতখানা দিয়ে ভাইকে জড়িয়ে ধরেছিল। আমি ঠিক তার পাশেই অথচ একটু পেছনে ব'সে ছিলুম। সেই অবস্থাতেই সে তার ডান হাতখানা হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে আমার বাঁ হাতটা আস্তে ধ'রে ফেললে। সে স্পর্শের মধ্যে সঙ্কোচ ছিল বটে, কিন্তু অনুনয় ছিল অতি গভীর। এক হাতে মুমূর্ষু ভাই, যার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে সে একত্রে বেড়ে উঠেছে, সারাজীবনের কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি যার সঙ্গে জড়িত—মুষ্টিবদ্ধ বালুকণার মতন যত জোরে সে তাকে আঁকড়ে ধরছে তত তাড়াতাড়িই তার জীবনকণা নিঃশেষ হয়ে চলেছে, এ কথা যে সে বুঝতে পারছে না তা নয়—অন্য হাতে অজানা, অপরিচিত, অনাত্মীয় নবাগত আমরা। দু দিকে দুই তরফকে নিয়ে দিদিমণি ব'সে রইল। আমি দেখতে লাগলুম, তার দুই চোখ দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল বিশুদার ডান কাঁধের ওপর।

প্রকাণ্ড হল-ঘর, ছুটো দেওয়ালগিরিতেও ঘরের সবটা আলোকিত হয় নি। দূর প্রান্তের কোণগুলোতে অন্ধকার জমা হয়ে রয়েছে। বিশুদা অশ্রুবিহীন উদাস দৃষ্টিতে সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। বিড়ি ও গড়গড়ার ধোঁয়াগুলো ঠাণ্ডার চোটে স্তম্ভিত হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে শূন্যে ঝুলতে থাকল। একবার পরিতোষের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার বড় বড় টানা চোখ দুটোতে অশ্রু টলটল করছে। সব স্থির নিস্তব্ধ—এরই মধ্যে স্থাণুর মতন আমরা চারটি প্রাণী ব'সে রইলুম।

আজ শীতের এই সন্ধ্যায়, আলোকহীন কলিকাতা নগরীর মধ্যে নির্বান্ধব পুরীতে একটা ঘরে একলা ব'সে এই জাতক লিখছি। মাথার ওপরে কালিমালিপ্ত বিজলী বাতির ফানুস জ্বলছে, তা থেকে আলোর চাইতে অন্ধকারই বিকিরণ করছে বেশি। জগদ্ব্যাপী মারণ-যজ্ঞের মন্ত্র মাথার ওপর দিয়ে গর্জন করতে করতে আকাশময় ছুটোছুটি করছে। চারিদিকে মৃত্যু ছাড়া আর কথা নেই, মৃত্যু ছাড়া আর সংবাদ নেই, মৃত্যু ছাড়া আর কাব্য নেই। প্রভাত-সূর্য উঠছে মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে, পূর্ণিমার চাঁদ সে তো মৃত্যুরই দূত। ব'সে ব'সে মৃত্যুর কথাই মনে হচ্ছে। মৃত্যু—সে তো আমার অজানা নয়। শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত বারে বারে আমি মৃত্যুর রূপ দেখেছি কত ভাবে! আমার কত প্রিয়জনকে যে সে নিয়ে চ'লে গিয়েছে, তার আর

ঠিকানা নেই। কিন্তু গভীরভাবে মৃত্যুর কথা এর আগে আর কখনও চিন্ত করি নি। আজ অকস্মাৎ অনুভব করলুম, ধীরে, সন্তর্পণে, অতি অতর্কিতে মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে আমার সম্মুখে, অতি নিকটে। এত নিকটে যে একটুখানি হাত বাড়ালেই তাকে ছুঁতে পারা যায়। মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে দূর-অতীতের আর এক শীত-সন্ধ্যার সেই ছবিখানা মনের মধ্যে ফুটে উঠছে। মনে হচ্ছে, সেই অন্ধকার গৃহকোণের দিকে চেয়ে চেয়ে মৃত্যুপথযাত্রী বিশুদার মনে সেদিন কি ভাবের উদয় হচ্ছিল!

বোধ হয় আধ ঘণ্টা সেই রকম চুপচাপ কাটবার পর দিদিমণি বিশুদাকে বললেন, খানকয়েক হালকা লুচি আর একটু মাংসের সোরুয়া পাঠিয়ে দিচ্ছি, খেয়ে ফেল্।

এতক্ষণে বিশুদা বাংলায় বোনের কথার উত্তর দিলে, তুই তো কিছুতেই মানবি না। পাঠিয়ে দে, যদি খেতে পারি তো খাব।

এবার দিদিমণি উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও টেনে তুললে, কারণ আমার বাঁ হাতখানা তখনও সে তেমনই চেপে ধ'রেছিলে।

বিশুদার ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। আমাদের ঘরের কাছে এসে দিদিমণি বললে, তোরা ততক্ষণ ঘরে গিয়ে আরাম কর্, খাবার তৈরি হতে দেরি হবে, আমি একটু দেখিগে যাই। বই পড়বি?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে দিদিমণি বললে, আচ্ছা, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দিদিমণি চ'লে গেল। আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকে নির্দিষ্ট বিছানায় শুয়ে গল্প করতে লাগলুম। প্রথমেই পরিতোষ ধরা-ধরা গলায় বললে, গুরুমার চেয়ে এরা ঢের ভাল লোক। এদের ছেড়ে কখনও যাব না।

আমি চুপ ক'রে রইলুম, কারণ গুরুমা যে কি রকম লোক সে সম্বন্ধে আজও আমার কোন স্পষ্ট ধারণা হয় নি। মৃত্যুর মতন আজও সে আমার কাছে রহস্যই হয়ে আছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর পরিতোষ বললে, জয়া ফিরে এলে তাকে এইখানেই একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে এনে রাখা যাবে। তারও কাশীর ওই হুল্লোড় ভাল লাগে না।

এবার আমি তাকে একটু খোঁচা দিয়ে বললুম, তুই কি মনে করেছিস, তোর

কথা শুনে কাশী ছেড়ে জয়া এখানে চ'লে আসবে? মেয়েমানুষকে তা হ'লে এখনও চিনতে পারিস নি তুই।

আমার কথা শুনে পরিতোষ বললে, জয়া তোর রাজকুমারীর মতন নয়। আমি বললে সে আমার জন্যে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে।

পরিতোষ ভাগ্যবান! জয়া সম্বন্ধে এই ধারণা নিয়েই সে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছে।

বোধ হয় পনেরো-বিশ মিনিট বাদে বিকেলবেলাকার সেই ভরত এসে খান তিন-চার বাংলা বই আমাদের দিয়ে চ'লে গেল। আমরা এক-একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ভরত আমাদের জাগিয়ে খাবার ঘরে নিয়ে গেল।

রান্নাঘরের এক কোণে কাঠের উনুনে হিন্দুস্থানী ঠাকুর রাঁধছে, কাছেই একটা মোড়ার ওপর দিদিমণি ব'সে। দেখলুম, দুটো বড় বড় পিঁড়ির সামনে দুখানা খালি থালা পাতা রয়েছে। আমরা সেখানে উপস্থিত হওয়ামাত্র দিদিমণি বললেন, নাও, ব'সে পড়, আর রাত ক'রে কি হবে?

ঠাকুর গরম গরম রুটির দু পিঠে ঘি মাখিয়ে আমাদের থালার ওপরে দিয়ে গেল। দিদিমণি দু বাটি মাংস আমাদের দুই থালার পাশে রেখে বললেন, আর কিছু নেই, এই দিয়েই খেতে হবে।

দুটি বেশ বড় বাটি ভর্তি ঘন দুগ্ধ মেরে আহার সমাধা ক'রে ঘরে এসে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া গেল।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট

আপনি

দেখুন, একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন, আপনি কি ধরাদাক্ষিণ্য সমস্ত বিসর্জন দিয়ে আমার পেছনে বরাবরই লেগে থাকবেন? বাড়িতে তো নানান ঝঞ্ঝাটের জ্বালায় একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি না, কিন্তু বাইরেতেও যদি আপনি এই রকম প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তোলেন, তা হ'লে তো মারা পড়ি মশাই।

ট্রামে তো জায়গা থাকতেও দরজার সামনেটিতে দাঁড়িয়ে থেকে উঠতে দেবেন না,

পকেট কাটবেন, কি মেয়েদের চলমান দেহের ক্ষণিক স্পর্শে নিজেকে পুলকিত ক'রে নেবার জন্যে এই কীর্তি প্রতিদিন করবেন, তা বুঝতে পারি না—যখন উঠবেন তখন তো আমি নাবছি দেখেও এক ধাক্কায় আমার হাড়গোড় চূর্ণ করতে এগিয়ে আসবেন, সিগারেট সমেত হাইজাম্পিংএর কায়দা দেখিয়ে উঠে এই বাজারে আমার জামাটা পোড়াবেন, আবার সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে গেলে তো রেক্টিফায়েড স্পিরিটের মত দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠে আমাকেই মারতে আসবেন, উপদেশ দেবেন—এত ভিড়ে ওঠেন কেন! সবই তো দুবেলা শুনে শুনে কান প'চে গেল, কিন্তু আপনার কায়দার ঠেলায় আমার চরণযুগলের অবস্থা দেখেছেন কি? সকলে চতুর্দিক থেকে এইভাবে আমাকে পদদলিত ক'রে ছেঁচে দেবেন, এটা কি ঠিক হচ্ছে? বলবেন হয়তো, আহা, ননীর পুতুল, কে না কষ্ট ক'রে আজকাল যাতায়াত করছে! ঠিক কথা, আরাম ক'রে যাওয়া এ জীবনে হবে না; জানি, কারণ প্রতিদিন বুঝছি যে; সুস্থদেহে আশপাশ থেকে আপনাদের নানারূপ সিমামের যে প্রয়োগ আমার ওপর দিয়ে চলছে, তাতে আর বেশিদিন পৃথিবীতে আমাকে ভিড় বাড়াতে হবে না। বয়েস তো হয়েছে, এত উৎপাত সইবে কেন? তবু একটু নেকনজর করুন প্রভু! আচ্ছা, যাতায়াতের ভিড়ের কথা ছেড়ে দিন, আপনি আমার ওপর এত বিরূপ কেন বলতে পারেন? আমি আপনার কি পাকা ধানে মই দিয়েছি?

ট্রেনে ক'রে কলকাতায় এলুম, সেদিন আমায় এ রকম ভোগান্তি করালেন কেন বলুন তো? এক ঘণ্টা আগে এসে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলুম, দয়া ক'রে আমার টিকিটটা একটু আগে কেটে দিলে আপনার কিছু ক্ষতি হ'ত কি? অথচ আপনি যে কারুর কাটলেন না, তা তো নয়? ওপাশ থেকে ভাবের লোকদের হাতে তো টিকিটগুলি নির্বিবাদে কেটে দিলেন। আপনি তো আমার সঙ্গে কথাই কইলেন না প্রথমে, দেখলেন ভিড় জমেছে খুব, তবু তো একটু দয়া হ'ল না দাদা! ব'সে ব'সে চা খেলেন, পান খেলেন, মৌজ ক'রে বিড়ি ধরালেন, সবই তো ঘুলঘুলি দিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখলুম। ভাবলুম, কৃপাময় বোধ হয় এইবার আমাদের প্রতি করুণা করবেন। কিন্তু আপনার ব'য়ে যাচ্ছে, আপনি টেবিলের ওপর পা তুলে খবরের কাগজটা টেনে পড়তে শুরু করলেন, আপনার অ্যাসিটেন্টকে ডেকে বীরবিক্রমে একটা হেডলাইন প'ড়ে শোনালেন—শোন হে রমেশ, আমাদের স্বদেশবাসীর প্রতি অত্যাচার, বেটারা ব্ল্যাকমার্কেট ক'রে ক'রে দেশটাকে খেলে, অথচ এদিকে আপনার জাতভায়েরা একশো জন লাইন ক'রে দাঁড়িয়ে, তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই, দশ কি পাঁচ মিনিট আগে আপনি দয়া ক'রে একবার উঠে জানলার কাছে এগিয়ে এলেন, বিরক্ত হয়ে সেই সময় আমি একটু লাইনের বাইরে গেছি, অমনই হুস ক'রে ট্রেন এসে গেল, আপনি সবশেষে আমায় যখন মুখ ভেঙিয়ে ভাঙানি দিতে শুরু করেছেন, সেই সময় ট্রেনখানি 'হুস্তোর' 'হুস্তোর' করতে করতে বেরিয়ে চ'লে

গেল, এর পর তিন ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে, ঝড়-বৃষ্টি সব-কিছু ওরই মধ্যে ব'য়ে গেল, আপনারও ব'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার নাজেহাল—এই আর কি!

খামকা এই ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে আপনার কি লাভটা হ'ল বলতে পারেন? আমি কি বিলিতী জাহাজে চেপে এ দেশে পদার্পণ করেছি?

শুধু কি আপনি?—আপনার গুষ্টিবর্গ সবাইকেই আপনি কি সব ঘাঁটিতে বসিয়ে রেখেছেন, না আপনিই পোশাক বদলে সর্বত্র ব'সে থাকেন, বুঝতে পারি না।

সেদিন মনি-অর্ডার করতে গেলুম, আপনি তো আমাকে মারমুখো হয়ে তেড়ে এলেন। কেন মশাই, আমি তো আপনাকে বেয়ারিংয়ে মনি-অর্ডার নিতে বলি নি, একটু ভদ্রভাবে বললে আপত্তি ছিল কি? এত রাগের কারণটা কি? খাটুনি! হায় রে, আপনি তো তবু চেয়ারে ব'সে পাখা খাচ্ছেন, আমরা যে গরমে ঠায় ঘণ্টাদুয়েক বাইরে দাঁড়িয়ে আপনার চাঁদমুখখানি দেখছি, এতেও কি আপনার মায়া হয় না?

বিল জমা দিতে যাই, সেখানেও দেখি, আপনি সেই মেজাজ নিয়ে ব'সে আছেন। অত কথা কি, ছুটির দিনে বায়স্কোপে থিয়েটারে টিকিট কেটে আপনাদের উপকার করতে গেলুম, তার ভেতরেও আপনি যে রকম খিঁচিয়ে উঠলেন, যেন আমি পাস চাইছি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দোব, আপনি অর্ধেক সময় তো তা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। ব্যাঙ্কে চেক ভাঙাতে যাব, কিন্তু সেটি একটু চালু হ'লে আমাকে তো কথা কইবার মত উপযুক্ত লোক ব'লে মনে করবেন না। আপনি খোঁজখবর দেবার জন্যেই আপিসে ব'সে আছেন, কিন্তু কোন বিষয়ে খোঁজ নিতে গেলে আপনার দাঁত-কিড়িমিড়ি শুনলে তো আত্মারাম শুকিয়ে যায়। আর বিপদে প'ড়ে আপনার কাছে ছুটে গেলে তো আর কথাই নেই, যাতে আরও জড়িয়ে পড়ি তার ব্যবস্থার জন্যে তো উঠে প'ড়ে লাগবেন। কাপড়ের দোকানের লাইসেন্স পেলে তো আপনার থিয়েটারের অ্যাকটারদের চেয়েও মেজাজ চড়া হয়ে যায় দেখি। থানা, পুলিস, আদালত, স্বদেশী নেতাগিরির কথায় আর কাজ কি! সবার ঠেলায় তো প্রাণ যায়। সরকারী কোন জায়গায় বসলে আর আপনাকে পায় কে? মেজাজ টাইফয়েডের রুগীর চেয়ে দু-ডিগ্রীর ওপর গরম, খুব ভদ্রলোক হ'লে চেঁচিয়ে অবশ্য আপনি ব'লে দেন, যান যান, বেশি বকবেন না, রিপোর্ট করুন গে।

আরে মশাই, আপনি তো বললেন রিপোর্ট করুন, কিন্তু ঝঞ্ঝাটটা পোয়াবে কে বলুন তো? আর কথায় কথায় রিপোর্ট ক'রে চলতে গেলে তো হোঁচট খেতে খেতেই প্রাণান্ত হয়, আপনি ফুল দেখাবেন সত্যি, কিন্তু অত মুখস্থ থাকলে তো হাইকোর্টে আমার জায়গাটা আর খালি প'ড়ে থাকত না, সেটা স্মরণশক্তির অভাবে পারি নি ব'লেই তো প্রতিনিয়ত আপনার ফুল এবং গুলের ঠেলায় চোখে সর্ষেফুল দেখছি। এর থেকে আপনি একটু ক্ষেমাঘেন্না ক'রে রেহাই দিলে যে বাঁচি।

উঃ! সংসারে এত ঝঞ্ঝাট—এ কি কোন দিন কল্পনা করতে পেরেছি? তা হ'লে কাত্তিকের দোহাই, বিশ্বাস করুন, এ জায়গা বহু পূর্বে ছেড়ে পালাতুম। আপনি ঈশ্বরের বরপুত্র জানি, কিন্তু আমরা তা না হ'লেও পুণ্যিপুত্র তো বটে, কিন্তু আমাদের এইভাবে লাঞ্ছিত করাটা কি আপনার ধর্ম হচ্ছে?

আপনি দুধে জল মেশাবেন, আমাকে তা খাঁটির দরে কিনতে হবে। আপনি ঘিয়ে সাপের ব্যাঙের চর্বি মেশাবেন, আমায় তা গব্য ঘৃত ব'লে মেনে নিয়ে গলাধঃকরণ করতে হবে, আপনি পচা মাছ, বাছপড়া আলু চালান দেবেন আমায় তা পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। যদি প্রতিবাদ করতে যাই, আপনি সকলের সামনে খপ ক'রে আমার হাত থেকে জিনিস কেড়ে নেবেন। বাসে ট্রামে ওঠাবেন, কিন্তু নামবার সময় রেলওয়ে-মেল যেমন পোষ্টব্যাগ ফেলে দিয়ে যায়, তেমনই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। আপনি হোটেলে পচা মাল ভেজিটেব্‌ল ঘিয়ে লঙ্কা দিয়ে ভেজে আমার ক্ষিদের সুযোগ নিয়ে যাতে খুব শিগগির সব ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে ওপর দিকে যেতে পারি হাসিমুখে তার বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন। রাস্তায় যখন চলবেন, তখন কনুয়ের গুঁতো মেরে হাঁটবেন, আমার জামার হাতার সঙ্গে আপনার ছাতা আটকে গেলেও আপনি তাই চড়চড় ক'রে ছিঁড়তে ছিঁড়তে চলবেন। আমি রাত্তিরে খেটেখুটে এসে একটু চোখ বুজব, অমনই পাশের বাড়ির জানলার পাশে ব'সে হয় বাবা আদমের আমলের একটা গ্রামোফোন ও তাঁর সমসাময়িক খান চারেক রেকর্ড বাজাতে শুরু করবেন, নয় পনেরো-কুড়ি টাকার একটি হারমোনিয়াম নিয়ে প্রাণপণ বেসুরো চীৎকার ক'রে রাত একটা আন্দাজ মুক্তি দেবেন। এইভাবে আমাকে পাগল ক'রে আপনার কি সুখটা হচ্ছে সেটা তো বুঝতে পাচ্ছি না!

আপিসে চলেছি, আপনি ওপর থেকে এক ঝোড়া কুটনোর খোসা কিংবা পানের পিচ মাথায় ফেলে দিলেন, নেহাত তা না দিলেও জল খেয়ে অন্তত আধ গেলাস আমার মাথায় ছুঁড়ে দিলেন, এটা কি খুব ভাল হ'ল?

ঘরে ব'সে আছি, আপনি সেখানে ব'সে ব'সে পানের পিচ ফেলছেন, রাস্তার ফুটপাতে আপনি আঁবের খোসা ছড়িয়ে আমাকে নিপাতিত করার চেষ্টা করছেন, আমি যা সাজাচ্ছি, আপনি তা নষ্ট করছেন, আমি একটা কিছু গড়লে আপনি তা সর্বাগ্রে যাতে ভাঙে তার জন্যে আদাজল খেয়ে উঠে প'ড়ে লেগেছেন, আমি ভুল ক'রে আপনার দেশে জন্মগ্রহণ ক'রে ফেলেছি ব'লেই কি আপনি আমার ওপর এত ক্ষেপে আছেন? দয়াময়, একটু স্থিরচিত্তে আমার অবস্থাটা ভাবুন, আর কটা দিন এই সব বাজে ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রেহাই দিয়ে আমায় একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দিন প্রভু!

শ্রীবিরূপাক্ষ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৮৭৩—১৯৩২

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি (২২ মাঘ ১২৭৯) তারিখে বর্দ্ধমান ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে প্রভাতকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়; আদি নিবাস—হুগলী জেলার গুরুপ।

ছাত্র-জীবন

প্রভাতকুমারের পিতা ঈ. আই. রেলে সামান্য বেতনে সিগনালারের কর্ম্ম করিতেন। এই কারণে তাঁহাকে বিভিন্ন ষ্টেশনে—কখন বাবা, কখন জামালপুর, কখন বা দিলদারনগরে কাটাইতে হইয়াছে। প্রভাতকুমার তাঁহার মাসতুত-ভাই রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে জামালপুরে থাকিয়া স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা করিতেন। রাজেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন ঐ স্কুলের শিক্ষক। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫ বৎসর বয়সে, প্রভাতকুমার জামালপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে পরীক্ষা-দানকালে তাঁহার বয়স ১৩ বৎসর ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রভাতকুমার কোন্ সালে কোন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ক্যালেণ্ডার হইতে তাহার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

এন্‌ট্রান্স ...	জামালপুর এইচ. সি. ঈ. স্কুল ...	২য় বিভাগ ...	ইং	১৮৮৮
এফ্. এ. ...	পাটনা কলেজ ...	৩য় বিভাগ ...		১৮৯১
বি. এ. ...	পাটনা কলেজ ...	...		১৮৯৫

বিবাহ

এফ্. এ. পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রভাতকুমার হালিশহর-নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ব্রজবালা দেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহ জামালপুরেই হয়, অন্নদাপ্রসাদ জামালপুরেই কর্ম্ম করিতেন। ১৩০৩ সালের চৈত্র-সংখ্যা (ইং ১৮৯৭) 'ভারতী'তে ব্রজবালা দেবী "ভূত না চোর?" নামে ভাষান্তর হইতে গৃহীত একটি গল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিবাহের ছয় বৎসর পরে (ইং ১৮৯৭) তিনি দুইটি শিশুসন্তান—অরুণকুমার ও প্রশান্তকুমারকে রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন।

কেরাণীগিরি

বি. এ. পরীক্ষা দিবার পর, সরকারী ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রভাতকুমার অস্থায়ী ভাবে সিমলা-শৈলে ভারত-সরকারের একটি আপিসে কিছুদিন চাকুরী করিয়াছিলেন। সিমলা দর্শন করিয়া তিনি ১৩০৪ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'প্রদীপে' (ইং ১৮৯৮) "সিমলা-শৈল" নামে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সিমলা হইতে ফিরিয়া প্রভাতকুমার কলিকাতায় ডিরেক্টর-জেনারেল অব টেলিগ্রাফসের আপিসে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হন (ইং ১৮৯৯)।

বিলাত-যাত্রা

কেরাণীগিরি প্রভাতকুমারকে বেশি দিন করিতে হইল না। অকস্মাৎ বিলাতযাত্রার এক অভাবনীয় সুযোগ তাঁহার মিলিয়া গেল।

পঠদ্দশা হইতেই প্রভাতকুমার 'ভারতী' পত্রিকায় লিখিতে শুরু করেন। ১৩০২ সাল (ইং ১৮৯৫) হইতে উক্ত পত্রিকায় তাঁহার রচনাবলী নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং তিনি 'ভারতী'র এক জন বিশিষ্ট লেখক বলিয়া পরিগণিত হন। সরলা দেবী তখন 'ভারতী'র সম্পাদিকা। প্রভাতকুমারের সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। টেলিগ্রাফ আপিসে কার্য্যকালে 'ভারতী'-সম্পাদিকার সহিত প্রভাতকুমারের আলাপ-পরিচয়ের সূচনা হয়। উভয়ের পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় এবং শেষে সরলা দেবীর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যস্থতায় বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হয়। স্থির হয়, সরলা দেবীর মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যয়ে প্রভাতকুমার ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করিবেন; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিলে যথারীতি বিবাহ হইবে।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি প্রভাতকুমার কাহাকেও কিছু না জানাইয়া বিলাত যাত্রা করেন। ইহার অল্প দিন পূর্ব্বে (ইং ১৯০০) তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মাতা তখন সদ্য বৈধব্যশোকে কাতরা। প্রভাতকুমার অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন; পাছে মাতা আপত্তি করিয়া বসেন, এই ভয়ে তিনি তাঁহার নিকটও বিলাতযাত্রার কথা পূর্ব্বাহ্নে ব্যক্ত করেন নাই।

তিন বৎসর পরে, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে প্রভাতকুমার ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু নূতন করিয়া সংসার পাতা তাঁহার ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠে নাই, তাঁহার মাতা এই বিবাহে সম্মতি দেন নাই। এই অপ্রত্যাশিত আঘাত তাঁহার মর্ম্মমূলে এক দূরপনেয় ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল,—তিনি চিরতরে সংসার-ধর্ম্মের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন।

ব্যারিষ্টারি

বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রভাতকুমার অল্পদিন দার্জিলিঙে ছিলেন। সেখানে প্র্যাক্‌টিসের সুবিধা হইবে না বুঝিয়া তিনি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রংপুরে গমন করেন। তথায় চারি বৎসর প্র্যাক্‌টিস করিবার পর গয়া তাঁহার কর্ম্মস্থল হয় (মে ১৯০৮), এখানে তিনি আট বৎসর ছিলেন।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী' সম্পাদন

ব্যবহারাজীবের কার্য্যে প্রভাতকুমারের মন বসিতেছিল না। সাহিত্যের কমল-বনে তিনি যে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সমস্ত চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মানসী' ও 'সাহিত্যে' প্রকাশিত তাঁহার ছোট গল্প ও উপন্যাসগুলি পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমে 'যোড়শী', 'দেশী ও বিলাতী', 'গল্পাঞ্জলি' ও 'নবীন সন্ন্যাসী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে বাংলা কথা-সাহিত্যের আসরে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী ও বিষয়বস্তু—সকল দিক্ দিয়াই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল প্রভাতকুমারের ছোট গল্পগুলি তদানীন্তন বাংলা-সাহিত্যে রীতিমত সাড়া জাগাইয়াছিল, বিশেষতঃ বিলাতের বিষয়বস্তু লইয়া লেখা 'দেশী ও বিলাতী' পুস্তকের গল্পগুলির অভিনবত্ব পাঠক ও সমালোচক সকলেরই চমক লাগাইয়া দিয়াছিল। এমনি ভাবে সাহিত্যচর্চা দ্বারা যেমন তাঁহার যশোবৃদ্ধি হইল, তেমনি অর্থাগমও হইতে লাগিল। অন্তরের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এবং আর্থিক সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তাঁহার একান্ত আগ্রহ জন্মিল। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিল না, অচিরেই সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসে (ইং ১৯১৪) নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ রায় 'মানসী' সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। মহারাজার চেষ্টায় এই সময় হইতে 'মানসী'র সহিত প্রভাতকুমারের সম্পর্ক দৃঢ়ীভূত হয়। ইহার দেড় বৎসর পরে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণকে সহযোগী-রূপে গ্রহণ করিয়া জগদিন্দ্রনাথ 'মর্ম্মবাণী' নামে সাহিত্য-বিষয়ক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৩ শ্রাবণ ১৩২২ (ইং ১৯১৫) তারিখে। প্রভাতকুমার স্বনামে ও ছদ্ম নামে* নিয়মিতভাবে রচনা দিয়া 'মর্ম্মবাণী'কেও সাহায্য করিয়াছিলেন। ছয় মাস পরে 'মর্ম্মবাণী' উঠাইয়া দিয়া এবং 'মানসী'র কলেবর বৃদ্ধি করিয়া, ১৩২২ সালের ফাল্গুন মাস (ইং ১৯১৬) হইতে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশ করা হয়। নাটোরাধিপতির অনুরোধে তাঁহার সহযোগিরূপে প্রভাতকুমার 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সম্পাদক হন। তিনি তখনও গয়ায় প্র্যাক্‌টিস করিতেছিলেন; প্রথম কয়েক মাস পত্রিকা বাহির হইবার পাঁচ-সাত দিন পূর্ব্বে গয়া হইতে কলিকাতায় আসিতেন, তাহার পর কলিকাতায় স্থায়িভাবে অবস্থান করিবার সুযোগ মহারাজই করিয়া দেন। 'মানসী

* "শ্রীজানোয়ারমোহন শর্ম্মা" এই ছদ্ম নামে প্রভাতকুমার "সুগন্ধলোম পরিণয়" নামক একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক 'মর্ম্মবাণী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কোন পুস্তক বা গ্রন্থাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

ও মর্ম্মবাণী' ১৩৩৬ সালের মাঘ সংখ্যা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই ১৪ বৎসর কাল প্রভাতকুমার সুষ্ঠুভাবে পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়াছিলেন।

আইন-কলেজে অধ্যাপনা

গয়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রভাতকুমার নাটোরাধিপতির চেষ্টা-যত্নে ১ আগষ্ট ১৯১৬ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল-কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সাহিত্য-পরিষদের গুণগ্রাহিতা

১৩৩৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রভাতকুমারকে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

মৃত্যু

৫ এপ্রিল ১৯৩২ (২২ চৈত্র ১৩৩৮, রাত্রি ২টা) তারিখে কলিকাতায় প্রভাতকুমারের মৃত্যু হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

প্রভাতকুমার স্বল্পভাষী, শিষ্টাচারসম্পন্ন, নিরহঙ্কার ও সুমিষ্ট মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মগোপনপ্রয়াসী ; সভা-সমিতির ঝিল্লিঝঙ্কার হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া আজীবন নীরবেই সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন। অনাবিল সাহিত্য-রস পরিবেশন করিয়া পাঠক-সাধারণকে আনন্দদানই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত, নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা কখনও তাঁহাকে বিভ্রান্ত করে নাই। আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, এবং এই দুইটি গুণের দ্বারা তিনি বন্ধুগোষ্ঠীর হৃদয়ে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যিক প্রভাতকুমার অপেক্ষা মানুষ প্রভাতকুমার যে ছোট ছিলেন না, সে-পরিচয় লাভের সৌভাগ্য খুব বেশী লোকের হয় নাই।

রচনাবলী

প্রভাতকুমার ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্য-সেবা সুরু করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রাথমিক রচনাগুলির নিদর্শন পুরাতন "ভারতী", 'দাসী' ও প্রদীপে'র পৃষ্ঠায় মিলিবে। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা বোধ হয় ১২৯৭ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা (ইং ১৮৯০) 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত "চির-নব" নামে একটি কবিতা ; এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ১৭। ইহার পরবর্ত্তী চারি বৎসরে আমরা প্রভাতকুমারের কোন রচনার সন্ধান পাই না। কবিযশপ্রার্থী হইলেও তাঁহার মন ক্রমশঃ প্রবন্ধ ও

গল্প রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে তিনি স্মৃতিকথায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"প্রথম বৎসরের 'প্রদীপ', ১৩০৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি' গল্পটিই সর্বপ্রথমে লিখিত ও প্রকাশিত ;* কিন্তু তখন আমি ছিলাম "কবি", সুতরাং গল্পে নিজের নাম না দিয়া শ্রীরাধামণি দেবী একটি কাল্পনিক নাম সহি করিয়া দিয়াছিলাম।† এই কাল্পনিক নামটির একটু ইতিহাস আছে। তাহার পূর্ব্ব বৎসর কুন্তলীনের বাৎসরিক পুরস্কারের বিষয় ছিল 'পূজার চিঠি'—স্ত্রী যেন প্রবাসী স্বামীকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিতেছে, এটা, ওটা জিনিষের সহিত এক বোতল কুন্তলীন আনিতেও অনুরোধ করিতেছে—এইরূপ পত্র রচনা করিতে হইবে। শ্রীমতী রাধামণি দেবীর বেনামিতে আমি একখানি পত্র রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম ; উহা প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য, ওই নামটির উপর কেমন মায়া হইয়া যায় ; গল্পের ছদ্মনাম-স্বরূপ উহাই ব্যবহার করি। কুন্তলীনেরা কেমন করিয়া জানিতে পারেন, পত্রখানি আমার লেখা। সেই অবধি উঁহারা পুরস্কার ঘোষণার সময় লিখিয়া দেন, কেহ আসল নাম গোপন করিয়া ছদ্মনাম ব্যবহার করিলে পুরস্কার পাইবেন না।.....

রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই। তিনি আমায় যখন গদ্য লিখিতে অনুরোধ করেন, আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম—'কবিতার মা বাপ নাই, যা খুসী লিখিয়া যাই—কবিতা হয়। কিন্তু গদ্য লিখিতে হইলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন ; সে পাণ্ডিত্য আমার কই ?'

ইহাতে রবিবাবু উত্তরে লেখেন, 'গদ্য-রচনার জন্য প্রধান জিনিস হইতেছে রস। রীতিমত আয়োজন না করিয়া, কোমর না বাঁধিয়া, সমালোচনা হউক, প্রবন্ধ হউক, গল্প হউক, একটা কিছু লিখিয়া ফেল দেখি। ইহার ফলে 'দাসী'তে চিত্রার এক সমালোচনা লিখিয়া পাঠাই, তাহাতে কোন নাম দিই নাই ;‡ আর, 'প্রদীপে'র জন্য ওই গল্প রচনা করি। কিন্তু গল্পের কথা রবীন্দ্রবাবুকে আমি

---

* ইহা ঠিক নহে, ১৩০৪ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রভাতকুমারের "কাজির বিচার" গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

† ইহা কল্পিত নাম নহে। প্রভাতকুমারের শ্যালক-পত্নীর নাম ছিল রাধামণি দেবী।

‡ 'দাসী', মে ১৮৯৬ (বৈশাখ ১৩০৩) সংখ্যা দ্রষ্টব্য। লেখার শেষে লেখকের নাম ছিল না, বার্ষিক সূচীতে ছিল। কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে ১৩২০ সালের 'ভারতী'র অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রভাতকুমারের "দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর" ও "নীলকুল-বাসুদেবের ব্রতকথা" প্রকাশিত হইয়াছিল।

জানাই নাই। সেই সংখ্যা 'প্রদীপ' 'ভারতী'তে সমালোচনা করিয়া রবিবাবু (তিনি তখন 'ভারতী'র সম্পাদক) আমার গল্পটির সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ভাদ্রের 'প্রদীপে' আর একটি গল্প ছাপা হইল, 'বেনামী চিঠি',—তাহাও ওই রাধামণির বেনামীতে! রবিবাবু এবারও 'ভারতী'তে ইহার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিলেন। তখনও তিনি জানেন না যে, আমিই রাধামণি। দুইবার এইরূপ অনুকূল সমালোচনা হওয়াতে আমার বুক বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসর 'প্রদীপে' নিজ মূর্ত্তি ধরিয়াই বাহির হইলাম। 'অঙ্গহীনা' এবং 'হিমানী' গল্প দুইটি আমার স্বাক্ষর-যুক্ত হইয়া বাহির হইল।

এক বৎসর সম্পাদকতা করিয়া রবিবাবু 'ভারতী' ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদন আরম্ভ করিলেন। সেই বৎসর ভারতীতে 'ভুল ভাঙ্গা' বাহির হইল।"—"মনীষা-মন্দিরে" : কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত—'সঙ্কল্প', অগ্রহায়ণ ১৩২১।

গ্রন্থপঞ্জী

প্রভাতকুমারের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী তারিখগুলি বেঙ্গল লাইব্রেরির মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। **নব-কথা** (গল্প)। কলিকাতা, কার্ত্তিক ১৩০৬ (২০ ডিসেম্বর ১৮৯৯)। পৃ. ২৩৪।

২। **অভিশাপ** (ব্যঙ্গকাব্য)। ইং ১৯০০ (?)

৩। **ষোড়শী** (গল্প)। রঙ্গপুর, আশ্বিন ১৩১৩ (২০ অক্টোবর ১৯০৬)। পৃ. ৩০১।

৪। **রমাসুন্দরী** (সামাজিক উপন্যাস) রঙ্গপুর, ১৩১৪ সাল (২৬ এপ্রিল ১৯০৮)। পৃ. ২৩১।

৫। **শাহজাদা ও ফকীর-কন্যার প্রণয়-কাহিনী; কাটা মুণ্ড** (পৃ. ১৯); **গুল বেগমের আশ্চর্য্য গল্প** (পৃ. ৬৭)। ১৩১৬ সাল (ইং ১৯০৯)।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাতকুমার ভাষান্তর হইতে গৃহীত এই তিনটি গল্প তিনখানি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ("মুসলমানী কেচ্ছা নং ১, নং ২, নং ৩") নামমাত্র মূল্যে প্রচার করিয়াছিলেন। পুস্তিকায় লেখকের নাম ছিল না। প্রথম দুইটি গল্প 'নব-কথা'র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩১৮) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; তৃতীয়টি আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

৬। **দেশী ও বিলাতী** (গল্প)। গয়া, আশ্বিন ১৩১৬ (১৫ অক্টোবর ১৯০৯)। পৃ. ৩৪৮।

৭। **নবীন সন্ন্যাসী** (উপন্যাস)। গয়া, ১ ভাদ্র ১৩১৯ (৬ সেপ্টেম্বর ১৯১২)। পৃ. ৪৪৬।

৮। **গল্পাঞ্জলি** (গল্প)। গয়া, আশ্বিন ১৩২০ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩)। পৃ. ১৯৭।

৯। **রত্ন-দ্বীপ** (উপন্যাস)। গয়া, আষাঢ় ১৩২২ (১৪ আগষ্ট ১৯১৫)। পৃ. ৩৪৯।

১০। **গল্পবীথি** (গল্প)। কলিকাতা, ১ আষাঢ় ১৩২৩ (২০ জুন ১৯১৬)। পৃ. ২৭০।

১১। **জীবনের মূল্য** (উপন্যাস)। ফাল্গুন ১৩২৩ (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭)। পৃ. ২৪০।

১২। **পত্রপুষ্প** (গল্প)। ১৩২৪ সাল (১৮ আগষ্ট ১৯১৭)। পৃ. ১৯৮।

১৩। **সিন্দুর-কৌটা** (উপন্যাস)। বৈশাখ ১৩২৬ (২০ মে ১৯১৯)। পৃ. ৪২০।

১৪। **বারোয়ারি উপন্যাস**। [বৈশাখ ১৩২৮] ইং ১৯২১। পৃ. ২৪৪। ইহার ৯-১১ পরিচ্ছেদ প্রভাতকুমারের লিখিত।

১৫। **গহনার বাক্স** ও অন্যান্য গল্প। শ্রাবণ ১৩২৮ (১৬ আগষ্ট ১৯২১)। পৃ. ১৮৮।

১৬। **মনের মানুষ** (উপন্যাস)। ১৩২৯ সাল (১০ আগষ্ট ১৯২২)। পৃ. ৩০৪।

১৭। **হতাশ প্রেমিক** ও অন্যান্য গল্প। পৌষ ১৩৩০ (২২ জানুয়ারি ১৯২৪)। পৃ. ২৫৩।

১৮। **আরতি** (উপন্যাস)। ১৩৩১ সাল (১ অক্টোবর ১৯২৪)। পৃ. ১৭২।

১৯। **সত্যবালা** (উপন্যাস)। ১৩৩১ সাল (১৫ এপ্রিল ১৯২৫)। পৃ. ২৩৪।

২০। **বিলাসিনী** ও অন্যান্য গল্প। অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ (২৭ নবেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ১৮৬।

২১। **সুখের মিলন** (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩৩৪ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭)। পৃ. ১৭২।

২২। **যুবকের প্রেম** ও অন্যান্য গল্প। ১৩৩৫ সাল (২৫ জুন ১৯২৮)। পৃ. ১৯৪।

২৩। **সতীর পতি** (উপন্যাস)। ১৩৩৫ সাল (৮ অক্টোবর ১৯২৮)। পৃ. ৩৬০।

২৪। **প্রতিমা** (উপন্যাস)। ১৩৩৫ সাল (৯ নবেম্বর ১৯২৮)। পৃ. ১৩২।

২৫। **নূতন বউ** ও অন্যান্য গল্প। ১৩৩৫ সাল (২৫ মার্চ ১৯২৯)। পৃ. ২২৩।

২৬। **গরীব স্বামী** (উপন্যাস)। ? (২৫ এপ্রিল ১৯৩০)। পৃ. ২৮৭।

২৭। **নবদুর্গা** (উপন্যাস)। ? (৩১ জুলাই ১৯৩০)। পৃ. ২৪৫।

২৮। **জামাতা বাবাজী** ও অন্যান্য গল্প। ১৩৩৮ সাল (৫ নবেম্বর ১৯৩১)। পৃ. ২২৮।

২৯। **বিদায় বাণী** (উপন্যাস)। ৬ পৌষ ১৩৪০ (২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৩)। পৃ. ২৬৮।

ইহার ১৫২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রভাতকুমারের রচনা; বাকী অংশ শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের।

প্রভাত-গ্রন্থাবলী, ১ম-৫ম ভাগ। জানুয়ারি ১৯২৩—সেপ্টেম্বর ১৯২৫ (বসুমতী)

ইহাতে (১৪-সংখ্যক পুস্তক ছাড়া) ১ম হইতে ১৮শ সংখ্যক পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২০-সংখ্যক পুস্তকের দুইটি গল্প—গুণীর আদর ও অম্বালিকা এবং ২২-সংখ্যক পুস্তকের তিনটি গল্প—যুবকের প্রেম, হারাধন ও পোষ্টমাষ্টার স্থান পাইয়াছে। ১ম ও ৩য়-৫ম ভাগ গ্রন্থাবলীতে "বিলাত ভ্রমণ" নামে কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে; এগুলি 'ভারতী' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। পঞ্চম ভাগ গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত দুইটি প্রবন্ধ—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও চিত্রা—১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'দাসী' হইতে গৃহীত।

Stories of Bengal Life—Translated from the Bengali of Prabhat Kumar Mukerji. By Miriam S. Knight and the Author. Calcutta 1912, Pp. 252 + 4 Glossary.

ইহাতে 'নব-কথা'র অন্তর্ভুক্ত "কুড়ানো মেয়ে"; 'ষোড়শী'র "বঙ্গ-শিশু", "কাশীবাসিনী", "কলির মেয়ে", "ছদ্মনাম" ও "ভুল শিক্ষার বিপদ" এবং 'দেশী ও বিলাতী' পুস্তকের "প্রতিজ্ঞা-পূরণ", "উকীলের বুদ্ধি", "হাতে হাতে ফল" ও "খালাস"—এই ১০টি গল্পের ইংরেজী অনুবাদ আছে।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা—

প্রভাতকুমারের রচিত বহু কবিতা 'ভারতী', 'দাসী' ও 'প্রদীপে' মুদ্রিত হইয়াছিল; এগুলির মধ্যে কেবলমাত্র 'অভিশাপ'ই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার লিখিত অনেক গদ্য-রচনাও বিভিন্ন মাসিকের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া আছে; এই সকল রচনা সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমরা পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার কতকগুলি রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

নীলকুল-বাসুদেবের ব্রতকথা	...	'ভারতী', পৌষ ১৩০২
ছেলে মানুষ করা	...	আশ্বিন ১৩০৩
সিমলা-শৈল (সচিত্র)	...	'প্রদীপ', ফাল্গুন ১৩০৪
চিত্ত-বিকাশ (সমালোচনা)	...	ফাল্গুন ১৩০৫
গাজিপুরে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় (সচিত্র)		আষাঢ় ১৩০৭
"সর্ববিষয়ে স্বদেশী"	...	'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩১৩
ভূতনামানো	...	চৈত্র, ১৩১৪
কুমীর পোষা (সচিত্র, সংকলন)	...	কার্ত্তিক ১৩১৭
বঙ্কিমচন্দ্র-জীবনপঞ্জী	...	'মানসী', চৈত্র ১৩২১
সূক্ষ্মলোম পরিণয় (পঞ্চাঙ্ক নাটক)	...	'মর্ম্মবাণী', ১৩ শ্রাবণ...১৩২২
চন্দ্রের কলঙ্ক	...	২ ভাদ্র ১৩২২
পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত কালিদাসের গল্প	...	'মানসী ও মর্ম্মবাণী', ভাদ্র ১৩২৫
কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব-সূচক একটি কিম্বদন্তী		পৌষ ১৩২৮
সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর	...	'সচিত্র শিশির', ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩০
চিত্তরঞ্জনের বাণী	...	'মাসিক বসুমতী', আষাঢ় ১৩৩২
অমৃতলালের স্মৃতিতর্পণ	...	শ্রাবণ ১৩৩৬
দুধ-মা (গল্প)	...	চৈত্র ১৩৩৮
কাজির বিচার (ছেলেদের গল্প)	...	'রামধনু', মাঘ ১৩৩৪
বীরবলের গল্প	...	কার্ত্তিক ১৩৩৫
কাজির বুদ্ধি	...	'রংমশাল', ১৩৩৫

১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসে (ইং ১৯১০) প্রকাশিত কবিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'ঘরের কথা'র ভূমিকা-স্বরূপ প্রভাতকুমার ছোটগল্প সম্বন্ধে যে নিবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাহাও পুনর্মুদ্রিত হওয়া উচিত।

১৩৩০ সালে প্রকাশিত, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ-প্রণীত 'হেমচন্দ্র' পুস্তকের ৩য় খণ্ডের পরিশিষ্টে "প্রভাতকুমারের স্মৃতিকথা" মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রভাতকুমার ও বাংলা-সাহিত্য

প্রভাতকুমারের গল্পগুলির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় নাই বলিয়া এ যুগের তরুণ সাহিত্য-রসিক সম্প্রদায় বাংলা কথা-সাহিত্যে প্রভাতকুমারের যোগ্য মর্য্যাদা দিতে কার্পণ্য করিয়া থাকেন; এই কারণে এই যুগের পাঠক-সমাজের সহিত তাঁহার রচনার পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই কালানুক্রমিক তালিকাটি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। প্রভাতকুমারের গল্পগুলি সরস বর্ণনায় এবং সুরস ব্যঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া আছে বলিয়া প্রাণধর্ম্মে চঞ্চল ও সজীব; সহৃদয় পাঠকের কাছে সেগুলির কখনও মার নাই। বিলাত হইতে দেশ, প্রাচীন হইতে আধুনিক—বিষয়ের বিস্তারেও প্রভাতকুমার আশ্চর্য্য প্রতিভা ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার রসিক সহানুভূতিপরায়ণ চিত্তটির স্পর্শও আমরা নির্ম্মল হাসি ও অক্রোধ ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া সর্বত্র লাভ করি; জীবন ও জগৎকে দেখিবার ও দেখাইবার সহজ ভঙ্গিটি আমাদিগকে স্বতঃই মুগ্ধ করে। প্রভাত-কুমারের সাহিত্যের প্রধান পরিচয় তাঁহার গল্পগুলি, তাহা সমালোচকের বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। তথাপি এ যুগের পাঠকের অবগতির জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাতকুমারকে লিখিত দুইখানি পত্র এখানে মুদ্রিত করিলাম। পত্রগুলি ইতিপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

কল্যাণীয়েষু, তোমার গল্পের বই দুটি [২য় সংস্করণের 'নব-কথা' ও 'ষোড়শী'] এখানে আসিয়া পাইয়াছি। মনে ভাবিলাম সব গল্পই ত পূর্ব্বে পড়া হইয়াছে—ইহা আর পড়িব কি? অন্যান্য সাধারণ লোকের মত অপূর্ব্বের প্রতি আমার একটু বিশেষ টান আছে। সময়টা তখন সন্ধ্যা, হাতে কাজ ছিল না তাই নিতান্ত অলসভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইতে সুরু করিলাম—দেখিতে দেখিতে মনটা আটকা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বার যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হুহু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ছোট গল্প লেখায় পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জ্জুন, তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্য্যের রশ্মির মত—আর কেহ কেহ আছে যাহারা মধ্যম পাণ্ডবের মত গদা ছাড়া যাহাদের অস্ত্র নাই—সেটা বিষম ভারি—তাহা মাথার উপর আসিয়া পড়ে, বুকের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে না। যাহা হউক তোমার প্রথম সংস্করণের পাঠকেরা

দ্বিতীয় সংস্করণেও যে ভীড় করিয়া দাঁড়াইবে নিজের মধ্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। ইতি ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৮। শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিধাম, [ইং ১৯১৩]

পরমকল্যাণাস্পদেষু, আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবে তোমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল আমার মনে পড়ে না—আমি জানকীর বাড়িতে (Mr. Ghosal) তোমাকে একদিন দেখিয়াছিলাম—তখন তোমার গোঁফের রেখা মাত্র ছিল। তোমার সেই সৌম্য মূর্ত্তিই আমার মনে অঙ্কিত রহিয়াছে। তোমার সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় না থাকিলেও তুমি আমার নিকট সুপরিচিত। তোমার রচিত কোন গল্প মাসিক পত্রিকাদিতে বাহির হইলেই আমি আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকি। তোমার গল্প আমার খুবই ভাল লাগে। বড় বড় ফরাসী গল্প লেখকদের গল্প অপেক্ষা তোমার গল্প কোন অংশে হীন নহে। তোমার প্রতিভায় বঙ্গসাহিত্যের এক অংশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার 'গল্পাঞ্জলি' উপহার পাইয়া যারপরনাই প্রীত হইলাম। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর। শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাব্য ও অলঙ্কার

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর সাহিত্যমীমাংসক ধারাধিপতি ভোজদেব মানব-দেহের সহিত কাব্য বা শব্দাত্মক সাহিত্যের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—

"শব্দ এবং অর্থ কাব্যের শরীর, রস (ভাব) প্রভৃতি কাব্যের আত্মা, (ওজঃ, শ্লেষ প্রভৃতি) গুণ শৌর্য প্রভৃতির ন্যায়, (কাব্যের) দোষ-সমূহ (মানবদেহের) কাণত্বাদির ন্যায়, রীতিসমূহ অবয়বের সন্নিবেশের সহিত তুলনীয় এবং অলঙ্কারসমূহ কটক কুণ্ডল প্রভৃতির সদৃশ।"

'কাব্যমীমাংসা'-রচয়িতা মহাকবি রাজশেখরও সারস্বতের 'কাব্যপুরুষে'র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"(হে বৎস!) শব্দ এবং অর্থ তোমার শরীর। সংস্কৃত তোমার মুখ; প্রাকৃত-ভাষানির্ম্মিত তোমার বাহুদ্বয়; তোমার জঘনদেশ অপভ্রংশভাষাময়; তোমার পদযুগল পৈশাচভাষা-বিনির্ম্মিত। তুমি সমতা, প্রসাদ, মাধুর্য এবং ওজোগুণযুক্ত। তোমার বচন উক্তিনৈপুণ্যে ভূষিত। রস তোমার আত্মস্বরূপ, তোমার রোমরাজি ছন্দোময়; অনুপ্রাস এবং উপমা প্রভৃতি তোমাকে অলঙ্কৃত করিতেছে।"

শব্দ এবং অর্থ যে সাহিত্যের বৈধ শরীর তাহা পূর্ব প্রবন্ধে সূচিত হইয়াছে (১)। কিন্তু গুণ, রীতি, অলঙ্কার, রস ইহাদের স্বরূপ কি? শব্দ এবং অর্থ হইতে ইহাদের পৃথক্‌ভাবে বিশ্লেষণ কি করিয়া সম্ভবপর? সাহিত্যমীমাংসক-সম্প্রদায় কাব্যশরীর ও রক্তমাংসগঠিত পুরুষদেহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন বটে; কিন্তু এই সাদৃশ্যের কোনও বাস্তব ভিত্তি আছে কি? ইহা কি false analogy নহে? পুরুষের চেতনা, কৃতি, ইচ্ছা, প্রভৃতির দ্বারা তাহার আত্মাকে অনুমান করা সম্ভবপর; তাহার শৌর্য্য, দাক্ষিণ্য, দয়া প্রভৃতি গুণ সাধারণের অনুভবগোচর; কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি আভরণ যে তাহার শরীরকে ভূষিত করে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না; তাহারা যে পুরুষদেহের সহিত অভিন্ন নহে, তাহা প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু শব্দার্থময় সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি আত্মা, গুণ, অলঙ্কার প্রভৃতির সেইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ প্রতীতি সম্ভব? কাব্যশরীরের উপাদান শব্দ ও অর্থ হইতে তাহার আত্মা, গুণ, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃতির পৃথক্‌করণ (abstraction) কি কাব্যমীমাংসকগণের একটা নিছক্ কল্পনামাত্র নহে?

প্রথমতঃ অলঙ্কার বিষয়েই আলোচনা করা যাউক। সাধারণ পাঠক যখন কাব্যসম্বন্ধে কোনও ধারণা করিতে যায়, তখন অলঙ্কারের কথা স্বতই তাহার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। দৈনন্দিন ব্যবহারজীবনের ভাষা ও সাহিত্য বা কাব্যের ভাষার মধ্যে প্রভেদ কোথায়?—সাধারণ পাঠককে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, অনেকেই বলিবে, অলঙ্কারে। আমাদের ব্যবহারজীবনের ভাষা 'আটপৌরে' নিরাভরণ; শব্দকে মার্জিত করিবার, তাহাকে বিশিষ্টভাবে বিন্যস্ত করিবার দিকে আমাদের লক্ষ্যই থাকে না। ব্যবহারজীবনে আমরা যখন মাননীয় ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ অবসরে, "মহাশয়! অনুগ্রহপূর্বক সভাস্থলে উপস্থিত হইলে বাধিত হইব" এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট সৌজন্য রক্ষিত হইল বলিয়া মনে করি, কবির লেখনী এই নিতান্ত সাধারণ আমন্ত্রণকেই কত বক্রভাবে, কত বৈদগ্ধ্যের সহিত পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন! "মহাশয়! আমাদের গৃহ অনুগ্রহপূর্বক অলঙ্কৃত করিবেন কি?" "মহাভাগের উদার আকৃতি দর্শনে আমাদের নেত্র সফল হইবে" ইত্যাদি। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রথম অঙ্কে মহারাজ দুষ্মন্তের আকস্মিক আশ্রমপ্রবেশে বিস্মিতা অনসূয়া তাঁহার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানিবার জন্য কত বক্রোক্তিরই আশ্রয় লইয়াছে :—

"আর্যের মধুর বিশ্রম্ভালাপ আমাকে (এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বিষয়ে) মন্ত্রণা দিতেছে যে, আর্য কোন্ রাজর্ষিবংশ অলংকৃত করিয়া থাকেন? কোন্ জনপদের অধিবাসিগণ মহাভাগের প্রবাসজনিত বিরহে পর্যুৎসুকহৃদয় হইয়া রহিয়াছে? কি নিমিত্তই বা আর্য এই নিয়তিশয় সুকুমার আত্মাকে তপোবনপরিভ্রমণ-জনিত ক্লেশের ভাজন করিয়াছেন?"

(১) দেশ : ১১ই ফাল্গুন ১৩৫২ ('সাহিত্যের সংজ্ঞা')।

আশ্রমকন্যা অনসূয়ার মুখে, "আর্য কোন্ দেশ হইতে আগমন করিতেছেন, কি জন্যই বা আর্যের এই তপোবনে আগমন?" দুষ্মন্তের প্রতি এইরূপ নিরাভরণ প্রশ্ন নিতান্তই প্রাকৃতজনোচিত হইত; কালিদাস তাহাকে বক্র করিয়াছেন, তাহাতে বৈদগ্ধ্যযোজনা করিয়াছেন, যাহার ফলে উহা সাহিত্যে স্থানলাভের যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই উক্তিকৌশল, এই "বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি", এই বক্রোক্তিই সাহিত্যিক সৌন্দর্যের নিদান। এবং সাহিত্যমীমাংসকসম্প্রদায় যে সকল উক্তিবৈচিত্র্য অলঙ্কার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সে সকলেরই মূলে আছে 'বক্রতা' বা 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি'। এই বক্রোক্তিরই অপর নাম 'অলঙ্কার'। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার এই বক্রোক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। বক্রোক্তিই তাহাদের প্রাণস্বরূপ। আচার্য কুন্তক তাঁহার 'বক্রোক্তি-জীবিত' গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"পদসমুদায়াত্মক বাক্যের সহস্র প্রকারে বক্রতা সম্পাদন করা যাইতে পারে এবং সেই 'বক্রতা'র মধ্যেই সকল অলঙ্কারবর্গ নিঃশেষে অন্তর্ভূত হইবে।"

যেমন, 'মুখটি অতিশয় সুন্দর', এই বাক্যটিকেই 'মুখটি চন্দ্রের মত সুন্দর', 'মুখটি যেন চন্দ্র', 'ইহা মুখ নহে, ইহা চন্দ্র', 'এই মুখটি চন্দ্র হইতেও অধিকতর সুন্দর', এইরূপে যথাক্রমে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারের আকারে শত শত কবিজনোচিত বিদগ্ধভঙ্গীতে প্রকাশ করা যাইতে পারে। উদ্দেশ্য একই—মুখের সৌন্দর্য বর্ণনা; বাক্যবিন্যাসেই কেবলমাত্র ভেদ। অতএব এই বিন্যাসভেদ বা বক্রতাই যে অলঙ্কারের 'জীবাতু' তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল, এবং এই বক্রোক্তিই 'লৌকিক' বাক্যসমূহকে কাব্যের পদবীতে উত্তীর্ণ করিয়া থাকে। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের 'কাব্য'লক্ষণ পর্যালোচনা করিলে সাহিত্যক্ষেত্রে অলঙ্কারের প্রাধান্য অতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইবে। চিরন্তন আলঙ্কারিক আচার্য ভামহ তাঁহার 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে বলিয়াছেন, "সুন্দরীর মুখচ্ছবি যতই কমনীয় হউক না কেন, ভূষাহীন হইলে কখনই তাহা শোভা পায় না।" পরবর্তীকালে বামনাচার্য তাঁহার "কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি" গ্রন্থের উপক্রমেই ভামহের এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, "অলঙ্কার-বশতই কাব্য সহৃদয়গণের আস্বাদনীয় হইয়া উঠে।" সাধারণ লৌকিক বুদ্ধিতে কাব্যের সহিত অলঙ্কারের সম্বন্ধ এমনই অবিচ্ছেদ্য যে, পরবর্তী একজন আলঙ্কারিক মন্তব্য করিয়াছেন :

"যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অনলঙ্কৃত শব্দার্থ-যুগলকে কাব্যরূপে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না, তিনি কি জন্যই বা অনলকে অনুষ্ণ বলিয়া কল্পনা করেন না?"

অভিপ্রায় এই : বহ্নিকে অনুষ্ণ বলিয়া কল্পনা করা যেরূপ অসম্ভব, অলঙ্কার-বিহীন শব্দার্থের কাব্যত্বকল্পনা ততোধিক অসম্ভব। অধিক কি, সাহিত্যবিচারে অলঙ্কারের এই

অত্যধিক প্রাধান্যই 'সাহিত্য-মীমাংসা'-শাস্ত্রের 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' ব্যপদেশের মূলে। সংস্কৃত সাহিত্যবিচারের যে কোনও গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রতিপাদ্য বিষয় শুধু অলঙ্কারই নয়, ধ্বনি, রস, রীতি, গুণ, দোষ প্রভৃতির বিশ্লেষণ এবং মীমাংসাও উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু অলঙ্কারবিচার আর সকল বিচারকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এবং সেইজন্যই সাহিত্যমীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহ সাধারণ পাঠকসমাজে 'অলঙ্কার' গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি'।

মানবসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার এককালে সৌন্দর্যের অপরিহার্য উপাদান ছিল। সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুপ্রাস, যমক, প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এবং উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অর্থালঙ্কারও যে কবিকর্মের অপরিহরণীয় সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কেন না, সাহিত্য অনেকাংশে সমসাময়িক লৌকিক সভ্যতার প্রতিচ্ছবি, তাহার মধ্য দিয়াই তাৎকালিক মানবের সৌন্দর্যবোধ ও রুচিজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে(২)। এখনও মানবসমাজ অলঙ্কারের মোহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। পূর্বে যাহা স্থূল ছিল, এখন তাহাই সূক্ষ্ম হইয়াছে; যাহা গুরু ছিল, তাহা লঘু হইয়াছে; যাহা 'কুণ্ডল' ছিল, তাহা 'কর্ণিকা' হইয়াছে। "তাঁরা সবাই অন্য নামে আছেন মর্ত্যলোকে"। কাব্যালঙ্কারের ক্ষেত্রেও সেই একই রীতি। নূতন নূতন অলঙ্কার উদ্ভাবিত হইতেছে, কত সূক্ষ্ম 'বক্রোক্তি', বাক্যযোজনায় কত নূতন বৈদগ্ধ্য! এ' সমস্তই কাব্যের সৌন্দর্যসাধনের জন্য। কেন না, সৌন্দর্যই অলঙ্কার।

অলঙ্কার যে সৌন্দর্যসাধনের একটি বিশিষ্ট উপাদান, তাহা কোনও সহৃদয়ই অস্বীকার করিবেন না। দোলায়িত শ্রবণকুণ্ডল যে কমনীয় রমণীমুখের সৌন্দর্য অধিকতর ঔজ্জ্বল্য-মণ্ডিত করে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেরই অনুভবসাক্ষিক। ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যক্ষেত্রে উপমা প্রভৃতি কাব্যালঙ্কারসমূহের যে একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন,—ইহা তাঁহাদের রুচিবোধেরই পরিচায়ক। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহারা ভ্রান্ত ছিলেন। তাঁহারা অলঙ্কারকেই সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অলঙ্কারকে বাদ দিয়া কবিকর্মের কোনও অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। তাঁহারা যদি উপমানভূত নারীদেহের সহিত কাব্যশরীরের পূর্ববর্ণিত সাধর্ম্য এই স্থলে লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবত এইরূপ প্রমাদে পড়িতেন না। কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি অপসারিত করিলে ভূষণহীন নারীদেহের

(২) "লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্"-নাট্যশাস্ত্র ১।১১৩। 'নাট্য' বা 'দৃশ্যকাব্য' সম্বন্ধে এই উক্তি 'শ্রব্যকাব্য' সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রযোজ্য।

কি কোনও সৌন্দর্যই অবশিষ্ট থাকে না? সাহিত্যে অলঙ্কারের আত্মভাব মানিয়া লইলে, তুল্যযুক্তিতে লৌকিক নারীসৌন্দর্যেরও এইরূপ অবস্থাই দাঁড়ায় বটে। কিন্তু কোনও সৌন্দর্যরসিক ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করিয়া লইবেন না। নারীদেহের লাবণ্য আছে—মুক্তাফলের অন্তর্গত তরল কান্তির ন্যায় যাহার প্রভা। অলংকারের অপসারণের দ্বারা সেই প্রভাতরল জ্যোতিকে অপসারিত করা যায় না। তাহাই নারীসৌন্দর্যের নিদান, তাহাই সৌন্দর্যের আত্মা। কাব্যের স্থলেও অলঙ্কারচ্যুতি কাব্যসৌন্দর্যের ব্যাঘাত করিতে পারে না। উপমা, রূপক প্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কার শব্দার্থরূপী কাব্যশরীর হইতে সরাইয়া লইলেও প্রকৃত সাহিত্যিক কবিকর্মের সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করা যায় না। এবং সমস্ত অলঙ্কার বিযুক্ত করিয়া লইলেও ভূষণহীন কাব্যশরীরের যে কান্তি আপন মহিমায় দীপ্তি পাইতে থাকে, যাহা কাব্যদেহের লাবণ্যস্বরূপ, তাহাই কাব্যবস্তুর আত্মা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। আনন্দবর্ধনাচার্য প্রমুখ ধ্বনিবাদিগণ কাব্যের এই অন্তর্নিহিত লাবণ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই প্রাচীন ভামহ প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণের অলঙ্কারের মোহ তাঁহাদের তত্ত্বদৃষ্টিকে আবৃত করিতে পারে নাই। এই লাবণ্যের অপর সংজ্ঞা 'ধ্বনি',—'বস্তুধ্বনি', 'অলঙ্কারধ্বনি' 'রসধ্বনি'। ইহাদের মধ্যে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ কাব্যতত্ত্ব,—তাহা হইতেই কাব্যের উৎপত্তি, তাহাতেই স্থিতি এবং তাহাতেই পর্যবসান। সেইজন্য রসধ্বনিই তাঁহাদের মতে কাব্যের আত্মা। সেই আত্মার সন্ধান যিনি পাইয়াছেন, তিনি কি কখনও অলঙ্কারের মোহে মুগ্ধ হইতে পারেন?

এখানে অনেকেই প্রশ্ন করিবেন: 'ধ্বনিবাদিগণ কি তবে সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারগুলিকে নির্বাসিত করিলেন? প্রকৃত কবিকর্ম কি তবে একেবারেই নিরলংকার? ধ্বনিবাদের প্রবর্তক আনন্দবর্ধনাচার্য সাহিত্যিক অলঙ্কার-সমূহের উপযোগিতা ও অস্তিত্ব আদৌ অস্বীকার করেন নাই। প্রাচীন সাহিত্য-মীমাংসক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার বিরোধ শুধু তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ লইয়া। ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণ লৌকিক অলঙ্কারের সমস্ত ধর্ম নিঃশেষে সাহিত্যিক অলঙ্কারের স্কন্ধে চাপাইয়াছিলেন। কাব্যালঙ্কারসমূহ যে নারীদেহের প্রসাধনের সামগ্রী কটক কুণ্ডল প্রভৃতি লৌকিক অলঙ্কার হইতে কোনও অংশে পৃথক্ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার কোনও আভাস তাঁহাদের গ্রন্থে নাই। তাঁহারা মনে করিতেন, শ্রবণ হইতে কুণ্ডল অপসারিত করিয়া যেমন তাহার পরিবর্তে কর্ণিকাসংযোগ করা যাইতে পারে, সেইরূপ কাব্যেও অনুপ্রাস, উপমা, রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি শব্দার্থালঙ্কারসমূহ কবি তাঁহার ইচ্ছানুসারে গ্রহণ ও বর্জন করিতে পারেন। এই হানোপাদানবশত কাব্যসৌন্দর্যের এমন কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটিতে পারে, এইরূপ ধারণা তাঁহাদের ছিল না। আনন্দবর্ধন কর্তৃক ধ্বনিবাদের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইয়া গেল। আনন্দবর্ধন

দেখাইলেন যে, পূর্বাচার্যকল্পিত অলঙ্কারের এই যথেচ্ছ-সংযোগ-বিয়োগ সাহিত্যক্ষেত্রে কেন, লৌকিক প্রসাধনের ক্ষেত্রেও অসম্ভব। সাহিত্যের যাহা মূলীভূত তত্ত্ব, অর্থাৎ রসধ্বনি, অলঙ্কার তাহারই অনুযায়ী হইবে। আত্মার ঔচিত্য অনুযায়ী অলঙ্কারের যোজনা করিতে হইবে। অলঙ্কারের কোনও পৃথক্ সৌন্দর্য নাই। উপমা, যে উপমা বলিয়াই সর্বত্র সুন্দর হইবে, এমন কোনও নির্দিষ্ট বিধি নাই। অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে যতই শ্রুতিসুখকর হউক না কেন, সর্বত্রই তাহাদের এই মাধুর্য অখণ্ডিত থাকিবে, এইরূপ আশা করা যায় না। অভিনবগুপ্ত এই স্থলে একটি উদাহরণের দ্বারা ধ্বনিবাদিগণের এই মতবাদ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন: "শবশরীরে অলঙ্কারযোজনার দ্বারা কিছুমাত্র সৌন্দর্যসাধন করা যায় না, কেন-না, সেখানে আত্মার অস্তিত্ব নাই। বনিতাশরীর অলঙ্কার-মণ্ডিত হইলে দর্শকের হাস্যাবহ হইয়া উঠে, যেহেতু সেখানে আত্মার ঔচিত্য নাই।" অতএব কাব্যের আত্মস্বরূপ রসতত্ত্বের সদ্ভাব ও ঔচিত্য এই উভয়ের দ্বারা সাহিত্যে অলঙ্কার-যোজনা নিয়ন্ত্রিত হইবে। তবেই অলঙ্কার সৌন্দর্যের কারণরূপে বিবেচিত হইবে। নতুবা রসৌচিত্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে কবি অলঙ্কার-বিন্যাস করিবেন, তিনি সাহিত্যিক সৌন্দর্যের মূল তত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে পুষ্পাভরণ-মণ্ডিতা শকুন্তলার যে মূর্তি মহারাজ দুষ্মন্তের দৃষ্টি বিমোহিত করিয়াছিল, সপ্তম অঙ্কে মহাকবি সেই শকুন্তলাকেই আবার নিরাভরণ মূর্তিতে দুষ্মন্তের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রথম ক্ষেত্রে আভরণ-বিন্যাস সম্ভোগের উপকরণ ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিরাভরণ পাণ্ডুতাই বিপ্রলম্ভ ব্যথাকে মূর্তিমতী করিয়া তুলিয়াছে। সমাহিত মহাদেবের তপোভঙ্গের জন্য প্রণয়মুগ্ধা পার্বতীর কত প্রসাধন, কত বিচিত্র আভরণ-বিন্যাস! কিন্তু উপেক্ষিতা, অবমানিতা পার্বতী যখন তপস্যায় প্রবৃত্ত, তখন তাঁহার অঙ্গ আভরণহীন, 'বার্ধকশোভি বল্কল' তাঁহার ভূষা! ধ্বনিবাদিগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সৌন্দর্যের এই নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এবং কবিও সহৃদয়সমাজে ইহার প্রচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। অলঙ্কারসমূহ—সাহিত্যিকই হউক, অথবা লৌকিক হউক, যে সৌন্দর্যের উপাদান বলিয়া গৃহীত হয়, সে তাহাদের স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, প্রকৃত রসের উৎকর্ষ সাধনের তাহারা উপায় বলিয়া। রসই উপেয়, অলঙ্কার তাহার উপায় মাত্র। যদি অলঙ্কারের অপসারণের দ্বারা রসবোধের গভীরতা বৃদ্ধি পায়, তবে তাহাই কর্তব্য। নিরলঙ্কার স্বভাবোক্তিই সেখানে অলঙ্কৃত বক্রোক্তির সমস্থানীয়।

ধ্বনিবাদের প্রচারের ফলে অলঙ্কার সম্বন্ধে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যান্য আরও পরিবর্তন সংঘটিত হইল। প্রাচীন মতবাদের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, কাব্যদেহের সহিত অলঙ্কারের সম্বন্ধ অনেকটা নারীদেহের সহিত

কটককুণ্ডলাদির সম্বন্ধের মতই। ইচ্ছানুযায়ী তাহার সংযোজন ও বিশ্লেষণ সম্ভবপর। কবি যেন পূর্বে মনে মনে অনলঙ্কৃত শুদ্ধ শব্দার্থযুগল কল্পনা করিয়া পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার ও উপমা, রূপক প্রভৃতি অর্থালঙ্কারসমূহ তাঁহার রুচি অনুসারে কাব্যদেহে বিন্যস্ত করেন। সুতরাং অলঙ্কারযোজনার অব্যবহিত পূর্বে অনলঙ্কৃত কাব্যশরীরের অস্তিত্ব তাঁহাদের মতে মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু অলঙ্কারযোজনায় ইহাই কি অনুভবসিদ্ধ পদ্ধতি? উত্তম কাব্যের যে সকল অলঙ্কার, তাহারা কি নারীদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কতকগুলি শিথিলবিন্যস্ত জড়-পদার্থমাত্র? যে আবেগবশে কবি তাঁহার অন্তর্নিরুদ্ধ রসধারা শব্দার্থযুগলের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই একই আবেগের দ্বারা কি অলঙ্কারসমূহও জন্মলাভ করে না? তাহাদের জন্য কি কোনও পৃথক প্রযত্নের বা অভিনিবেশের আবশ্যকতা উত্তমকবি উপলব্ধি করিয়া থাকেন? বিচার করিয়া দেখিলে প্রাচীন আচার্যগণের মতবাদের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে। 'কাব্যের অলঙ্কার' এইরূপ উক্তির দ্বারা 'কাব্য' ও 'অলঙ্কারে'র মধ্যে যে ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহার মূলে কোনও অভ্রান্ত যুক্তি নাই, এবং তাহা সহৃদয়ের অনুভববিরুদ্ধ। উত্তমকাব্যে শব্দ ও অর্থের সহিত অলঙ্কারের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রসাবিষ্ট কবিচিত্ত স্বগত ভাবের প্রকাশের দিকেই তন্ময়ীভূত হইয়া থাকে, শব্দ এবং অর্থ স্বতই উৎসারিত হইয়া আসে—বিচিত্র-বক্রোক্তির আকারে, বিবিধ অলঙ্কারের রূপ ধরিয়া। অতএব উত্তমকাব্যের যে সকল 'বক্রোক্তি' বা 'অলঙ্কার', তাহা শব্দার্থের কোনও বাহ্য বা আগন্তুক ধর্ম নহে। উহা শব্দার্থেরই অন্তরঙ্গ বিলাস। এইরূপে, যে সকল অলঙ্কার 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য' তাহারাই উত্তমকাব্যের প্রকৃত শোভার হেতু, তাহারাই প্রকৃত 'অলঙ্কার'। যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার কাব্যদেহের সহিত এইরূপ অন্তরঙ্গভাবে সম্বন্ধ নহে। তাহাদের উদ্ভাবনের জন্য কবির স্বতন্ত্র অভিনিবেশ আবশ্যক। রসাবিষ্ট কবিচিত্ত হইতে উহারা স্বতঃ উৎসারিত হইয়া উঠে না। তাহারা 'পৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য'। এইজন্য ধ্বনিবাদের প্রবর্তক আচার্য আনন্দবর্ধন পুনঃ পুনঃ 'ধ্বনিকাব্যে' বা 'উত্তমকাব্যে' অনুপ্রাস প্রভৃতি বর্জন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রকৃত বক্রোক্তি বা অলঙ্কার কবির চিন্তাধারারই অন্তরঙ্গ রূপ মাত্র। কিন্তু যে সকল অলঙ্কার উদ্ভাবনের জন্য কবিচিত্তের পৃথক অভিনিবেশ প্রয়োজন, তাহাদের সহিত কবির চিন্তাধারার কোনও আন্তর সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সেইজন্য, আনন্দবর্ধনাচার্য উহাদিগকে বহিরঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কার্য ও অলঙ্কারের মধ্যে অন্তরঙ্গতার তারতম্য লক্ষ্য করিয়া লৌকিক অলঙ্কারসমূহের ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ করিয়া গিয়াছেন। ধারাধিপতি ভোজদেব তাঁহার 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' শীর্ষক আলঙ্কারিক নিবন্ধে বলিয়াছেন: "অলঙ্কারসমূহ ত্রিবিধ, বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ ও মিশ্র। বহিরঙ্গের উদাহরণ যেমন,

বস্ত্র, মাল্য, (কটক, কেয়ূর প্রভৃতি) বিভূষণ। অন্তরঙ্গ যেমন, দন্তপত্রিকর্ম, নখচ্ছেদ এবং কেশবিন্যাস প্রভৃতি। মিশ্র যেমন, স্নান, ধূপ এবং (চন্দন, কুঙ্কুম প্রভৃতি) বিলেপন।"

সৌন্দর্যসম্বন্ধে যাঁহার সূক্ষ্মবোধ আছে, তিনিই উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগের যৌক্তিকতা স্বীকার করিবেন। বস্ত্রমাল্য-কুণ্ডল অপেক্ষা স্নান, ধূপবাস, কুঙ্কুমবিরচিত পত্রলেখা অধিকতর রমণীয়, তদপেক্ষা রমণীয় নখচ্ছেদ এবং অলকরচনা। ইহারা প্রত্যেকেই যে নারীদেহের প্রসাধনের উপাদান, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এই রমণীয়তার তারতম্য কিসের জন্য? সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে, অন্তরঙ্গতার তারতম্যই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? অলঙ্কার্য নারীদেহের সহিত যে অলঙ্কারের যত ঘনিষ্ঠ, যত অন্তরঙ্গ, যত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহার সৌন্দর্যই তত অধিক। বস্ত্রমাল্যবিভূষণ যত সহজে শরীর হইতে অপসারণ করা যাইতে পারে, সুরভিচন্দনের সুগন্ধ কিংবা কপোলবিন্যস্ত কুঙ্কুমরচিত পত্রলেখা, শুভ্রচন্দনের ললাটিকা মুছিয়া ফেলা তত সহজ নহে। সেইজন্য বিদগ্ধ রমণীগণের প্রসাধনের সামগ্রী কালাগুরুপত্রলেখা, অলকরচনা। কটককুণ্ডলের স্থূল প্রাকৃতহৃদয়হারী ঔজ্জ্বল্য তাঁহাদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধকে পীড়া দেয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই একই তত্ত্ব। কাব্যালঙ্কারসমূহকেও ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যিনি সুকবি তিনি বিদগ্ধ নারীর ন্যায় অলঙ্কার নির্বাচনের সময় (যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি বুদ্ধিপূর্বক নির্বাচন করেন না) যমক-অনুপ্রাস প্রভৃতি একান্ত বাহ্য অলঙ্কারসমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া চলেন। কাব্যদেহের সহিত তাহাদের সম্পর্ক অতিশয় শিথিল, নারীদেহের সহিত বস্ত্রমাল্যবিভূষণের ন্যায়। তাঁহারা যে সকল অলঙ্কার রচনা করেন, তাহা কাব্যশরীরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট—ললাটিকার ন্যায়, পত্রবিশেষকের ন্যায়। প্রথমত অলঙ্কার বলিয়া তাহাদের চিনিতেই পারা যায় না, শব্দ ও অর্থের সহিত তাহারা যেন একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া যায়। মহাকবিগণের অলঙ্কার রচনার ইহাই বৈশিষ্ট্য।

দেখা গেল, মহাকবিগণের লেখনীতে কাব্যদেহ হইতে শব্দার্থালঙ্কারব্রাজিকে পৃথক করিয়া বিশ্লেষণ করা দুষ্কর। শব্দার্থরূপী কাব্যদেহের সহিত তাহারা সম্পূর্ণরূপে একতা প্রাপ্ত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে: প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ যে অলঙ্কারসমূহকে কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতবাদের কি তবে কিছুমাত্র ভিত্তিই নাই? অলঙ্কার কি কখনই কাব্যের আত্মপদবীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না? কাব্যদেহের সহিত সাযুজ্য লাভই কি তবে তাহাদের বিবর্তনের চরম নিষ্ঠা? তাহারা কি কাব্যের গভীর অন্তঃপুরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে একেবারেই অসমর্থ? ইহার উত্তর দিয়াছেন আনন্দবর্ধনাচার্য ও অভিনবগুপ্ত। অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'লোচন' ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন: "প্রাচীন আচার্যগণের অলঙ্কার বিচার শুধু বাচ্য অলঙ্কারসমূহকে কেন্দ্র করিয়া। যে সকল অলঙ্কার অতি স্ফুটভাবে, স্পষ্ট কথায় কবি তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়া

থাকেন, ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য সেই সকল অলঙ্কারেরই মুখ্যত বিচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ওই সকল বাচ্য অলঙ্কারই কাব্যের আত্মা। কিন্তু আমরা দেখিলাম, অলঙ্কার, যাহা স্পষ্টভাবে কবির লেখনীতে প্রকাশিত হয়, তাহারা কখনই কাব্যের আত্মতত্ত্বের সহিত ঐক্য লাভ করিতে পারে না। দেহৈক্যপ্রাপ্তিই বাচ্য অলঙ্কার-সমূহের বিবর্তনের চরম নিষ্ঠা। তাহার জন্যও আবার অনন্যসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। মহাকবি প্রসাধননিপুণা বিদগ্ধ পুরন্ধ্রীর ন্যায় অলঙ্কারবিন্যাসে যতই কৌশলের পরিচয় দিন না কেন, তাঁহার লেখনী বাচ্য অলঙ্কারবর্গকে কখনই কাব্যশরীরের মর্যাদা উত্তীর্ণ করাইয়া অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিতে পারে না। কিন্তু সেই অলঙ্কার যখন ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা ব্যাপারের দ্বারা বোধিত হয়, যখন সাক্ষাৎভাবে বাচ্য না হইয়া কাব্যের অনুকরণের ('আণ্ডারটোন') দ্বারা প্রতীত হয়, তখন তাহাই অনায়াসে কাব্যের আত্মার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। ব্যঞ্জনা ব্যাপারের এমনই অলৌকিক মহিমা। স্পর্শমণির মত তাহা শরীরকে আত্মায় পরিণত করিয়া দিতে পারে, বহিরঙ্গকে অন্তরঙ্গতম করিয়া তুলিতে পারে, যাহা ছিল তুচ্ছ অলঙ্কার তাহাই ব্যঞ্জনায় অনির্বচনীয় স্পর্শ লাভ করিয়া অলঙ্কার্য হইয়া উঠে।" সুতরাং প্রাচীন আচার্য ও ধ্বনিসম্প্রদায়ের নব্য সাহিত্য-মীমাংসকগণের ভেদ শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্যে। অলঙ্কারের আত্মভাব ধ্বনিবাদিরাও মানিয়া লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নন, কিন্তু তাহা ব্যঞ্জনা ব্যাপারের দ্বারা বোধিত হইতে হইবে। 'বাচ্য' অলঙ্কারের সে ঐশ্বর্য নাই। কিন্তু, যদিও ধ্বনিসম্প্রদায়ের নবীন আচার্যগণ বিশেষ ক্ষেত্রে অলঙ্কারেরও আত্মভাব মানিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের মতে রসই কাব্যের মুখ্য আত্মা, কেন না কাব্যের সমস্ত উপাদানের রসেই পর্যবসান। রসই কাব্যের অন্তরতম তত্ত্ব। ভরতাচার্য তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে রসকে বীজের সহিত তুলনা করিয়াছেন (১)। যেমন ক্ষুদ্র বীজ অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হয়, ক্রমে যেমন তাহা মনোহর পুষ্পপল্লবে বিভূষিত হইয়া উঠে, এবং তাহার চরম পরিণতি যেমন বিচিত্র ফলসম্ভারে, সেইরূপ কবির অন্তর্গূঢ় রসবীজ আপন প্রাণশক্তির উল্লাসবশে শব্দ, অর্থ, অলঙ্কাররূপে আপনাকে অঙ্কুরিত, কুসুমিত, মঞ্জরিত করিয়া তুলে, সর্বশেষে পরিণত হয় সহৃদয়ের রসচর্বণায়। এই রসাস্বাদই কাব্যবৃক্ষের অমৃতময় ফল। সুতরাং রসবীজ হইতে কাব্যের উৎপত্তি, রসাস্বাদেই ইহার পরিসমাপ্তি। বৃহৎ শাখাপল্লববিশোভিত বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র অখণ্ড বীজেরই প্রাণশক্তির বিবর্তন মাত্র, সেইরূপ শব্দ অর্থ অলঙ্কার —কাব্যের যতকিছু উপাদান সমস্তই কবিচিত্তের নির্বিভাগ, অখণ্ড রসানুভূতির বিবর্তন মাত্র, কবির আন্তর পরিস্পন্দেরই বাহ্য আকার মাত্র। কবির কাব্যসৃষ্টির ইতিহাস শুধু তাঁহার নিবিড় রসানুভূতিরই আবেগময় বিবর্তনের ইতিহাস।

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

(১) "যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ॥"—নাট্যশাস্ত্র : ষষ্ঠ অধ্যায়।

মানুষের প্রকৃতি ও শাস্তি

মানুষ সমাজে বাস করে। একা থাকা তার পক্ষে কষ্টকর তো বটেই, একেবারে অসম্ভব বললেও ভুল হয় না। একটা কথা আছে যে, যে একা থাকে সে হয় খুব উঁচু ধরনের সাধু পুরুষ, না হয় তার প্রকৃতি একেবারে জন্তু-জানোয়ারের মত—He is either a saint or a beast. সাধারণ মানুষ সকলের সঙ্গে মিলে-মিশেই থাকতে চায়। কিন্তু সুখে স্বচ্ছন্দে সমাজে বাস করতে গেলে প্রত্যেক লোককেই কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হয়, অনেক ইচ্ছা দমন করতে হয়, আবার সময় সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক কাজ করতে হয়। কোন্ প্রবৃত্তি দমন করতে হবে, কোন্ ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে, এসব সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা আদিমকাল থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমশ আস্তে আস্তে গ'ড়ে উঠেছে। এই ধারণাগুলো সব সমাজেই যে একই রকম তা অবশ্য নয়। বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সমাজের ক্রমপরিণতি হয়েছে ব'লে, সামাজিক রীতিনীতির যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ভিন্ন ভিন্ন সমাজে দেখা যায়। ঐতিহ্য (traditions), প্রচলিত রীতি-নীতি, বিধিনিষেধ প্রভৃতির ভেতর দিয়েই মূলগত ধারণাগুলি প্রকাশ পায়, তাই এই সবের দ্বারা সামাজিক আচারব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণত লোকেরা তাদের নিজেদের সমাজের বিধিনিষেধগুলি মেনে নেয় এবং যে প্রথাগুলি তাদের সমাজে প্রচলিত, সেই অনুসারে চলাই কর্তব্য ব'লে তারা মনে করে। যারা মানে না, সমাজ তাদের অপরাধী ব'লে বিবেচনা করে এবং তাদের নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা করে।

এ পর্যন্ত যা বললুম, তা সবই বাস্তব ঘটনা এবং আপনাদের অজানা কিছুই নয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, এই মেনে নেওয়া এবং এই শাস্তির ব্যবস্থার মধ্যে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক সমস্যা আছে। লোকে মেনে নেয় কেন? আপনি আপনার সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে যেতে ইতস্তত করেন কেন? কে আপনাকে মেনে নিতে বাধ্য করে? কবে আপনি এই গতানুগতিক পন্থায় চলতে আরম্ভ করেছেন? সব নিয়মকানুনগুলি কি আপনি বুদ্ধির সাহায্যে বিচার ক'রে দেখে তারপর মানতে আরম্ভ করেছেন? যারা মানে তাদের সম্বন্ধে যেমন এইসব প্রশ্ন তোলা যায়, তেমনই যারা মানে না তাদের সম্বন্ধেও অনেক জানবার কথা আছে। কেন তারা মানে না? চুরি ডাকাতি প্রভৃতি সমাজের ক্ষতিকর এবং নিন্দার্হ কাজ কোন কোন লোক করে কেন? ব্যভিচার, খুন, জখম প্রভৃতি অনেক রকমের অপকর্ম সব সমাজেই কিছু কিছু হয়। যারা এই সব কাজে লিপ্ত থাকে, সমাজ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। পুলিস, বিচারালয়, হাজত, কারাগার, ফাঁসিকাঠ, এই শাস্তি-ব্যবস্থারই নিদর্শন। সমস্যা কিন্তু এখানেও আছে। এই শাস্তি-ব্যবস্থার ভিত্তি কি? A tooth for a tooth? তুমি যদি আমার ক্ষতি কর, আমিও তোমার ক্ষতি করব—এই মনোভাব থেকেই কি

শাস্তির উৎপত্তি? তারপর, শাস্তি দেওয়ার ফল কি হয়? শাস্তি ভোগ ক'রে অপরাধীর চরিত্র কতখানি সংশোধিত হয়, আর শাস্তি দিয়ে সমাজ কতখানি উপকৃত হয়? যে উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া হয়, প্রচলিত শাস্তি-ব্যবস্থায় সে উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়? এখন এই সব সম্বন্ধে, বিশেষ ক'রে শাস্তি সম্বন্ধে, একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

কেউ কেউ বলেন, প্রতিহিংসা মানুষের একটা সহজাত বৃত্তি, instinct, এবং এই বৃত্তি থেকেই শাস্তির উৎপত্তি। কিন্তু প্রতিহিংসা সহজাত বৃত্তি ব'লে ধ'রে নেবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। শাস্তি দেওয়ার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির ইঙ্গিত হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু প্রতিহিংসাই যে সব শাস্তির উৎপত্তির কারণ, তা বলা যায় না। পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়, কেউ গোষ্ঠীর ক্ষতিকর কোন কাজ করলে গোষ্ঠীর ভেতর সে যাতে আর কোনকালে উপস্থিত হতে না পারে, তার একটা ব্যবস্থা করা হত। তা তাকে গোষ্ঠী থেকে নির্বাসন ক'রেই হোক বা একেবারে হত্যা ক'রেই হোক। গোষ্ঠী থেকে সরিয়ে দেবার মূলে দু-তিন রকমের মনোভাব মিশ্রিত থাকত। অপরাধীকে শত্রু ব'লে বিবেচনা করা হ'ত। নিধনই শত্রুর একমাত্র ব্যবস্থা। অপরাধীকে আবার অশুচি ব'লে অন্য লোকেরা মনে করত। গোষ্ঠীর মধ্যে থাকলে তার সংস্পর্শে অন্য সকলেও অশুচি হয়ে যাবে, গোষ্ঠীকে শুচি রাখবার জন্যে তাই অপরাধীকে গোষ্ঠীচ্যুত করা দরকার। অপরাধীকে বলি দিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হবেন—এ ভাবটাও কিছু কিছু থাকত। সুতরাং প্রতিহিংসাপরবশ হয়েই যে তাকে হত্যা বা বিতাড়িত করা হ'ত, তা বলা যায় না।

অপরাধ ঠিক কাকে বলে, তা নির্ণয় করবার চেষ্টা সব দেশেই হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে মতামতও অনেক আছে। অপরাধের একটি লক্ষণ সম্বন্ধে সকলেই একমত। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধ কাজই অপরাধ, এবং যে সেইরকম কাজ করে সে অপরাধী। এটা অবশ্য খুব ব্যাপক অর্থ। ইংরেজীতে যাদের criminals বলি, তারা একশ্রেণীর অপরাধী, কিন্তু অপরাধী মাত্রেই criminal নয়। যে পুত্র বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ-পোষণ প্রভৃতির কোন ব্যবস্থা করে না, সমাজের চক্ষে সে অপরাধী বটে, কিন্তু criminal সে নয়। সব দেশের রীতিনীতি, বিধিনিষেধ এক রকম নয় ব'লে এক কাজ সব দেশেই অপরাধ ব'লে বিবেচিত হয় না, যেমন আত্মহত্যা ইংলণ্ডে অপরাধ, জাপানে কিন্তু নয়।

এই অর্থে অপরাধ কথাটি ব্যবহার করলে বলা যায় যে, অপরাধপ্রবণতা মানুষের সহজাত বৃত্তি। শিশুমাত্রই কতকগুলি বৃত্তি নিয়ে জন্মায়—কতকগুলি ভাল, কতকগুলি মন্দ। অর্থাৎ সমাজ কতকগুলিকে বাড়তে দিতে চায় আর কতকগুলিকে নষ্ট করতে চায়। প্রত্যেক নবজাত শিশুই একটি 'angel' দেবশিশুবিশেষ—রুসোর এ ধারণাটাও যেমন ভুল, প্রত্যেক মানুষই is an wolf to another man—হব্‌সের এ কল্পনারও তেমনই কোন ভিত্তি নেই। স্বার্থপরতা সহজাত। অনেক সামাজিক

অপরাধের ভিত্তি এই স্বার্থপরতা, সুতরাং বলা যায়, অপরাধপ্রবণতা সহজাত। যে সমস্ত বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হ'লে ভবিষ্যতে সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা অনিবার্য, সেইগুলি দমন করার চেষ্টা করা শিশুদের শিক্ষার একটি গোড়ার কথা। একটি শিশু যখন আর একটি শিশুর কাছ থেকে জোর ক'রে খেলনা কেড়ে নেয়, তখন সে অপরাধ করে না, কারণ ন্যায়-অন্যায় বোধ তখনও তার হয় নি। এই ন্যায়-অন্যায় বোধ moral sense, যতক্ষণ না তার জন্মায়, ততক্ষণ তার কাজ অপরাধ ব'লে বিবেচনা করা যেতে পারে না। প্রথমে বাবা-মার নিষেধের জন্যে অনেক স্বার্থপরতা নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির পরিচায়ক কাজ থেকে সে বিরত হয়। ক্রমে সে নিজের অহম্ Ego-র এক অংশকে এই নিজেকে নিষেধ করবার ভার দেয়। যে অংশ এই ভার নেয়, তাকে বলে অধিশাস্তা Super Ego. এই অবস্থা যখন আসে, তখন আর বাইরের কারও নিষেধ করবার প্রয়োজন হয় না। এই অধিশাস্তাই হয় তখন তার নীতিজ্ঞান, বিবেক, ধর্মজ্ঞান প্রভৃতির ভিত্তি। সুতরাং অধিশাস্তার গঠন ও স্বরূপের ওপর তার ভবিষ্যৎ চরিত্রের গুণাগুণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। উপযুক্তভাবে লালনপালন না করার দোষে অনেক সময় শিশুর অধিশাস্তার গঠন দুর্বল হয়, সে ক্ষেত্রে শিশুর ভবিষ্যতে অপরাধী (criminal) হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। পিতামাতার সতর্ক দৃষ্টি, উপযুক্ত শিক্ষা, সুস্থ সবল অধিশাস্তা গঠনের একমাত্র উপায়।

শিশুকে সাজা দেওয়ার কোন কথা হতে পারে না, তবে তাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কোন অন্যায় অপকর্ম থেকে শিশুকে বিরত করতে হ'লে এমন কোন ব্যবস্থা করা দরকার যাতে অপকর্মের ফলে তাকে একটু যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যন্ত্রণার কথা মনে হ'লে সে ভবিষ্যতে সে কাজ থেকে বিরত হতে পারে, কারণ যন্ত্রণা ভোগ করতে কেউই চায় না, শিশু তো নয়ই। কিন্তু এখানে খুব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যন্ত্রণা কি ধরনের হবে এবং তার পরিমাণ কতখানি হবে, সে বিষয়ে অভিভাবকদের বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। খুব রেগে গিয়ে বেদম প্রহার করলে কোন ফলই হয় না। এই উপায়, যাকে ইংরেজীতে conditioning বলে, অল্পবয়স্ক শিশুদের বেলায় কার্যকরী হয় বটে, কিন্তু একটু বয়স হ'লে, একটু বিবেচনা করতে শিখলে তখন আর এ উপায়ে কোন কাজ হয় না। কারণ বালক তখন অপকর্ম করার ফলে যে যাতনা, সেটা কি ক'রে এড়িয়ে যাওয়া যায় তারও একটা উপায় উদ্ভাবন ক'রে নেয়।

সমাজ যে শাস্তির ব্যবস্থা করে, তার মূলে কোন একটি মনোবৃত্তি আছে—এ ধ'রে নিলে ভুল। কোন কোন জায়গায় যেমন পোলাণ্ডে এ শাস্তির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে বজায় রাখা, অপরাধীকে সরিয়ে দিয়ে। এখানে অপরাধী আসল ব্যাপার নয়, আসল ব্যাপার সমাজ। আবার এও অনেকে বলেন, শাস্তির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করা, অথবা তাকে পুনরায় ওই কাজ করবার সুযোগ না

দেওয়া, অথবা প্রতিশোধ নেওয়া কিংবা অন্য লোককে ভয় দেখিয়ে ওই রকম কাজ থেকে বিরত করা, ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে শাস্তি-ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছে, তার ভিত্তিতে এই রকম একাধিক বৃত্তি আছে ব'লেই মনে হয়।

আধুনিক মনোবিদ্যা সমস্ত অপরাধতত্ত্বের ভেতর একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এনে দিয়েছে। পুরানো পথে চ'লে কেন ফল হচ্ছে না, তা যেমন এক দিকে দিয়েছে, অন্য দিকে তেমনই কি ভাবে অগ্রসর হ'লে ফল হতে পারে তার ইঙ্গিতও দিয়েছে। প্রথমেই বলি, যাকে অপরাধী ব'লে ধ'রে এনে শাস্তি দেওয়া হয়, তার মানসিক অবস্থা কি রকম, বাস্তবিক সে তার কাজের জন্যে দায়ী কি না, সেটা যে বিবেচনা করা উচিত মনোবিদ্যা এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উদ্দাম উন্মাদ অবস্থা ছাড়াও অনেক মানসিক রোগ এমন আছে, যাতে রোগী তার কাজকর্মের ওপর সমস্ত শাসন হারিয়ে ফেলে। একজন লোক বাড়ি থেকে বেরুতে হ'লেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক থেকে একশো অবধি একবার গুণে নেয়। একজন রাস্তার প্রত্যেক ল্যাম্প-পোষ্টেতে একটি × চিহ্ন দিয়ে যায়। যত চেষ্টাই করুক, কিছুতেই তারা নিজেদের দমন করতে পারে না। একটু বেশি মাত্রায় এগুলে এই ধরনের রোগীরা অনেক কাজ ক'রে বসতে পারে, যা সমাজের নীতিবিরুদ্ধ। শাস্তি দেবার আগে তাদের মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। সৌভাগ্যের কথা এই যে, আজকাল বিচারকগণও এই কথাটার যাথার্থ্য উপলব্ধি করেন এবং সন্দেহের কোন কারণ থাকলেই তথাকথিত অপরাধীকে 'নজরে' রাখবার এবং মানসিক-ব্যাধি-চিকিৎসকদের দিয়ে পরীক্ষা করাবার ব্যবস্থা করেন। সৌভাগ্যের কথা বলছি এইজন্যে যে, কিছুদিন আগেও অপরাধের সঙ্গে দায়িত্ববোধের যোগাযোগের কথা একেবারেই বিবেচিত হ'ত না। এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একটা কুড়ুলেতে একজন লোকের আঘাত লাগে ব'লে এথেন্স শহরের বিচারালয়ে কুড়ুলের বিচার হয়, কুড়ুল দোষী সাব্যস্ত হয়, সমস্ত নিয়মকানুন বজায় রেখে তাকে দেশের সীমানা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ওপারে ফেলে দেওয়া হয় অর্থাৎ তার নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়। সেদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডে কোন গাছ মানুষের ওপর ভেঙে পড়লে, তাকে বাজেয়াপ্ত করা হ'ত এবং বিক্রি ক'রে দেওয়া হ'ত। সুইজারলণ্ডে একটা গুয়ার একটি ছোট ছেলেকে খেয়ে ফেলেছিল ব'লে তার বিচার হয়, এবং হুকুম হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু হয় ততক্ষণ তাকে ফাঁসিকাঠে টাঙিয়ে রাখা হবে। এ অবস্থা থেকে আমরা যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

শাস্তির ফল কখন হয়? যখন অপরাধী নিজে মনে করে যে, সে সত্যই অপরাধী। তার নিজের যদি অপরাধজ্ঞান না থাকে, তাকে শাস্তি দিলে সে সমাজের ওপর অধিকতর বিরূপ হয় এবং সমাজের বিধিনিষেধকে আরও অবজ্ঞার চোখে দেখতে থাকে।

ভবিষ্যতে তার আবার অপরাধ করবার সম্ভাবনাই বেড়ে যায়। শাস্তির ফল একেবারে উল্টো হয়। অপরাধের তুলনায় শাস্তির গুরুত্ব যদি বেশি হয়, তা হ'লেও ঠিক এই রকম ফল হয়। যেখানে অপরাধজ্ঞান থাকে, সেইখানেই শাস্তি কার্যকরী হয়। সুতরাং শাস্তি দেবার সময়ে এ বিষয়েও দৃষ্টি রাখা উচিত, অপরাধীর মনে এ বিশ্বাস জন্মানো উচিত যে, সে সত্যই অপরাধ করেছে। এটা খুব ব্যাপক তথ্য। কি ক'রে একজন অপরাধীর মনে সে বিশ্বাস আনা যেতে পারে, সেটা অবশ্য বিভিন্ন অপরাধীর বেলায় বিভিন্ন রকমের হবে, মনোবিদ্যা এখানে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যেখানে অপরাধজ্ঞান আছে, অন্য কেউ শাস্তি না দিলেও অপরাধী নিজেই নিজেকে শাস্তি দেবার উপায় উদ্ভাবন করে। সে প্রায়শ্চিত্ত করে।

মনোবিদ্‌দের আবিষ্কারের ফলে এখন যে নীতি গ্রহণ করবার কথা ক্রিমিনোলজিষ্ট-দের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে সেটা এই যে, এক দিকে অপরাধীকে ভাল ক'রে বোঝা অর্থাৎ তার 'ব্যক্তিত্ব' (personality) বিশদভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, এবং অন্য দিকে সমস্ত সামাজিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই দুটি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারলে তবেই শাসন-সংশোধন প্রভৃতির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারবে। এই জ্ঞান অর্জনের দিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়াই এখন কর্তব্য। এই জ্ঞান লাভ যত করতে পারব, উন্নতির ব্যবস্থা ততই আয়ত্তে আসবে, কারণ knowledge is power—জ্ঞানই শক্তি।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

অসহায়

বাইরে চটক বজায় রেখে চলি
সমাজ-দাবি ঘরের দাবি মানি,
রাখতে ভঙ্গ আপনাকেই ছলি,
শুকিয়ে গেল রসিক মম প্রাণী।
এই ছলনা চালাই কত কাল,
আনছি কুমির আপনি কেটে খাল—
শুক্নো হ'ল হাজারো জঞ্জাল
বিদ্রোহী মন বলে, ফেল্ রে টানি—
কাঁধের জোয়াল ফেলতে তবু নারি
অভ্যাসেতেই চলছি টেনে ঘানি।

সংবাদ-সাহিত্য

আধুনিক কালে সাহিত্যের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হইয়া অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃততর তাৎপর্য লাভ করিয়াছে; শুধু রসাত্মক বাক্যই এখন কাব্য বা সাহিত্য নয়। হিত, মনোহারী ও দুর্লভ বচন; দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস; মায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনাও সাহিত্যের মর্যাদা পাইয়াছে—শুধু কথাসাহিত্য-গল্পসাহিত্য, কাব্য-কবিতাই সাহিত্যের সর্বস্ব নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে খাস বাংলা দেশে এবং বৃহত্তর বাংলায় যতগুলি বাংলা-সাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছে এবং সারা ভারতবর্ষে প্রবাসী বাঙালীদের উদ্যোগে বাৎসরিক যে বাংলা-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে সেগুলির বিবরণী পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, প্রায় গোড়া হইতেই দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্যাদি ভেদে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া সাহিত্য-মহীরুহ শোভা-সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইহা হওয়া স্বাভাবিক ও সঙ্গত। মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়কে দশজনের বোধগম্য ভাষায় চিত্তাকর্ষক-ভাবে উপস্থাপিত করার নামই সাহিত্য সৃষ্টি করা। প্রায় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কাল হইতে বাংলা দেশের চিন্তাশীল মনীষীরা নানা বিষয়ের সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সমাজে শিক্ষায় ও রাষ্ট্রে তাঁহারাই প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব করিয়াছেন। যে সকল রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ফলে আমরা অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের জড়তা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছি, বাংলা দেশের সাহিত্যিক মনীষীরাই প্রধানত সেগুলি পরিচালনা করিয়াছেন। রামমোহনের চিন্তাধারা; কৃষ্ণমোহন-অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর-রাজেন্দ্রলালের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যবুদ্ধি; ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভা; দেবেন্দ্র-নাথ-কেশবচন্দ্র-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাহিত্যাশ্রিত ধর্মবুদ্ধি; দ্বিজেন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্র-নাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-নবগোপাল-মনোমোহন-হরিশচন্দ্র - শম্ভুচন্দ্র - কৃষ্ণদাস প্রভৃতির স্বাদেশিকতামূলক রচনা ও বক্তৃতা এবং সর্বোপরি দীনবন্ধু-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা মাত্র অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষকে যে কতখানি অগ্রসর করিয়া দিয়াছে আজ আমরা তাহা জানিতে পারিতেছি। হিন্দুমেলা, নিখিল-ভারত কংগ্রেস ও স্বদেশী আন্দোলনের মূলেও চিন্তাশীল সাহিত্যিক মনীষীদের প্রবর্তনা কত গভীর এবং ব্যাপক, তাহাও আমরা অবগত আছি। শুধু বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেও আমরা দেখিতে পাই, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও কাব্যভেদে বিভিন্ন সাহিত্যিকেরাই বিবিধ বিপ্লব ও আন্দোলনের গোড়াপত্তন করিয়া সাধারণ মানুষের, সমাজের, জাতির ও দেশের সকল প্রকার বন্ধনশৃঙ্খল মোচন করিয়া

চলিয়াছেন। মানুষকে মুক্ত করিবার কাজে রুশো-ভল্টেয়ার, এমার্সন-হুইটম্যান-থোরো, শেলি-ওয়ার্ডসওয়ার্থ বায়রন, টুর্গেনিভ-টলষ্টয় ও মার্কস-এঙ্গেল্‌স্-লেনিন প্রভৃতি সাহিত্যিক মনীষীদের কীর্তি আজ কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইতালির দেনানৎসিও-মুসোলিনী, ইংলণ্ডের মর্লে-অ্যাসকুইথ-চার্চিল-ওয়াভেল, ভারতবর্ষের গান্ধী-জওহরলাল প্রধানত সাহিত্যবুদ্ধি লইয়া রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্ব করিয়াছেন ও করিতেছেন। সাহিত্যের সোনার কাঠির স্পর্শ ছাড়া পৃথিবীর মানুষের জড়তা কোনও দিনই কাটে নাই এবং ভবিষ্যতেও কাটিবে না।

• • •

গত ১৬ই জুনের মন্ত্রী-মিশনের সঙ্কল্পিত অন্তবর্তীকালীন শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া নিখিল-ভারত কংগ্রেস যেদিন গণপরিষদে ব্যাপক নির্বাচনের নির্দেশ দিলেন, সেই দিনই সমস্ত পৃথিবী অনুভব করিল যে, কংগ্রেস বিজয়ী হইল, এবং সমগ্র ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাহার দাবি নিঃসংশয়ে কায়েম হইল। আমরা সেই দিনই অনুভব করিলাম, দেশের সাহিত্য-বুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তানায়কেরা ভারতের ভবিষ্যৎ-কনষ্টিটিউশন-গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার অধিকার পাইবেন, মুসলিম লীগের একান্ত সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি কতকটা ক্ষতি করিলেও ভারতবর্ষের শুভ ও শ্রেয়কে ঠেকাইতে পারিবে না। আমরা সত্যসত্যই আশান্বিত হইলাম।

• • • •

কিন্তু বাংলা দেশের কংগ্রেস কর্তৃক যেদিন নির্বাচিতদের নামের তালিকা দাখিল করা হইল সেই দিন অনুভব হইল, এই পোড়া-দেশে দলগত স্বার্থবুদ্ধি এখনও শ্রেয়কে ও শুভকে বহু দূরে রাখিয়া চলিতেছে; যে সকল সাহিত্য-বুদ্ধিসম্পন্ন মনীষী নির্বাচিত হইলে দেশের সত্যসত্যই কল্যাণ হইত, তাঁহাদের অধিকাংশই বাদ পড়িয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সমস্যা তেমন কিছু গুরুতর নহে। কংগ্রেস যে অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রতিনিধি, একমাত্র বাংলা দেশে এবং পাঞ্জাবে সেই ভারতের অখণ্ডতা বিপন্ন হইতে পারে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তিসহ কথা বলিতে পারেন এমন লোক অবাঙালী হইলেও বাংলা দেশের তালিকায় স্থান পাইলে ভাল হইত। ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি হইতেন। বাংলার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সার্ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মত একজন চৌকস দার্শনিককে বাংলা দেশের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিলে আমাদের কল্যাণ হইত। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, কিরণশঙ্কর রায় ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক-সংস্পর্শ আছে সত্য, কিন্তু তাহা গৌণ। মুখ্যত সাহিত্যিক যোগ্য ব্যক্তি অনেকে ছিলেন, যাঁহারা ইতিহাস, ভাষা ও পুনর্গঠন পরিকল্পনার দিক দিয়া দেশের বিবিধ হিতসাধন করিতে পারিতেন। সার্ যদুনাথ সরকার, ডক্টর

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর মেঘনাদ সাহাকে, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, প্রমথ চৌধুরী, অধ্যাপক সত্যেন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন, সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতিকে বুদ্ধিবিচার ও সংগঠনের দিক দিয়া তালিকাভুক্ত করা উচিত ছিল। মোটের উপর প্রবল প্রতিপক্ষের সহিত বাক্য ও কৌশলের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে যাঁহারা দৃঢ় ও অনমনীয় থাকিতে পারিতেন, এমন বহু মনীষী বাদ পড়িয়াছেন, অথচ শুধু দলের ধ্বজা ধরিবার গুণে অতি সাধারণ ব্যক্তিও তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। দেশের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বাংলার কর্তারা কংগ্রেসের মূল নির্দেশকে অমান্য করিয়াছেন। ব্যাপক অর্থে দেশের সাহিত্য-বুদ্ধি রাজনৈতিক বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত না হওয়াতে গণপরিষদের নির্বাচন আশানুরূপ কল্যাণপ্রদ হইতে পারিবে না।

—

আমরা ভারতবর্ষ হইতে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দূর করিতে চাই। এমনিতেই তো পার্থক্যের অন্ত নাই, ইহার উপর কতকগুলি নামের মোহে মজিয়া এই পার্থক্যকে আমরা প্রতিদিন সুদৃঢ় ও কঠিন করিয়াই চলিয়াছি। দেশীয় খ্রীষ্টানদের মত ধর্মপরিবর্তনকারী মুসলমানেরাও যদি ধর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নামের পরিবর্তনসাধন না করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ কখনই এমন ভাবে প্রজ্বলিত হইত না। একই পরিবারে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নিরুদ্বেগে বসবাস করিতে পারিতেন। নামপরিবর্তনই জাতীয় ঐতিহ্য লুপ্তির প্রধান কারণ, সেই কারণ নিবারিত হইলে ধর্মের নামে কখনই ভারতবর্ষের অখণ্ডতা খণ্ডিত করার প্রস্তাব উঠিত না। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখনও যদি আমরা সাবধান না হই, তাহা হইলে নিছক নামের ফাঁদেই শিকার হইয়া আমরা মারা পড়িব। এইরূপ আত্মধ্বংসের অত্যাধুনিক দৃষ্টান্ত মিলিতেছে কলিকাতার খেলার মাঠে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় দেওয়ালে দেওয়ালে এবং দোকানে দোকানে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান, পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ (বাঙাল ও ঘটি) প্রভৃতির আঙ্কিক রেষারেষি বরঞ্চ বরদাস্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু খেলার মাঠে, যেখানে প্রতিযোগিতা নয়, পরস্পর মিলনই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, হিন্দু-মুসলমান ঘটি-বাঙাল ভেদে পরস্পর মাথা-ভাঙাভাঙি করিলে খেলার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইয়া যায়। ইহা নিবারিত হওয়া উচিত এবং অচিরাৎ ইহা নিবারণের একমাত্র উপায় সাম্প্রদায়িক অথবা প্রাদেশিক বিভেদগন্ধী নামের টিমগুলিকে নামপরিবর্তনে বাধ্য করা। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, ইহা হইলেই খেলার মাঠের তাঁবুর কাছাকাছি ইষ্টক-খণ্ডগুলি ও সোডার বোতলগুলি অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত থাকিবে। কর্তারা একটু শক্ত হইলেই এই অবাঞ্ছিত বিরোধের হাত হইতে আমরা বাঁচিতে পারি। আসলে প্রতিযোগী

বিভিন্ন দলে হিন্দু-মুসলমান ঘটি-বাঙাল মাদ্রাজী-মারাঠী তো একাকার হইয়াই আছে—মিথ্যা ও অস্বাভাবিক নামের লেবেল আঁটিয়া দিয়া মালাকে তরবারি করিয়া তুলিয়া অনর্থক রক্তপাতের সার্থকতা কোথায় ?

—

বিগত বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের একান্ত নিজস্ব প্রতিষ্ঠান অল-ইণ্ডিয়া রেডিও জার্মান ও জাপানী পুরুষদের ব্যাপক বলাৎকার-প্রবৃত্তি এবং জার্মান ও জাপানী নারীদের ঢালাও অসতীত্ব বিষয়ে যে ধারাবাহিক গবেষণা চালাইয়াছিলেন, আশা করিয়াছিলাম, তাহারই ধারা ধরিয়া তাঁহারা ইঙ্গ ও মার্কিন (সাদা ও কালো) সৈন্যাধিকৃত ভারতবর্ষে, জার্মানিতে ও জাপানে ফাল্‌তু নারীবাহিনী (W. A. C.) ও অন্যান্য একান্ত সাধারণ নারীদের উপর স্বর্গীয় প্রেম-ভালবাসার যে প্রবল বর্ষণ হইয়াছে, তাহারই কাহিনী বিবৃত করিবেন। বিষয়ান্তরে ব্যস্ত থাকায় তাঁহারা তাহা করেন নাই। বিষয়ান্তরটা কি তাহাই ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ দ্বিপ্রাহরিক মহিলা-মজলিস অনুষ্ঠানের পুরুষ ঘোষকের কাঁচুমাচু কণ্ঠস্বর কানে আসিল—"আপনি রাঁধতে পারেন ?" রজতবিগলিত নারীকণ্ঠে উত্তর শুনিলাম, "হ্যাঁ, দরকার হলে রাঁধতে হয় বৈকি।" প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম, ইহার পরেই হয়তো প্রশ্ন শুনিব, আপনি চুল বাঁধেন তো, ফুলুরি পান্তাভাত খান তো ?

কিন্তু ব্যাপার কি ? মহিলা-মজলিসে ঘাসের চপ, লঙ্কার রসগোল্লা, প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র ভক্ষ্যের নির্মাণপদ্ধতি বর্ণিত হইতে শুনিয়াছি বটে, কিন্তু কোনও ভাগ্যবতী রাঁধিতে পারেন কি না, সে বিষয়ে ঔৎসুক্য তো ইতিপূর্বে দেখি নাই। পরক্ষণেই এই সংশয়ের জন্য নিজেই লজ্জা পাইলাম, ও হরি, বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী অমুক অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা শাখার মহিলা-মজলিসকে পদধূলিদানে ধন্য করিয়াছেন। বাংলা দেশের মহিলাদের এই আকস্মিক সৌভাগ্য দর্শনে বিমূঢ় হইয়া প্লাগ খুলিয়া দিলাম। গোপালদা অন্তর্ধান করিয়া বাঁচাইয়াছেন, না হইলে কিছু বদ্‌জোবান শুনিতে হইত। শুনিতেছি, অতঃপর নাকি মহিলা-মজলিসে বিখ্যাত 'পতিতার আত্মকথা'র কিছু কিছু পাঠ প্রত্যহ হইবে।

—

কিন্তু এ সকলই বাহ্য। আসল ব্যাপার হইতেছে বাংলা দেশে আসন্ন দুর্ভিক্ষ। কথায় বলে, ইতিহাস পুনরাবর্তিত হয়—১৯৪২-৩ বা ১৩৫০-এর লক্ষণগুলি একে একে দেখা দিতেছে। ক্রিপ্‌স্-দৌত্য এবং তাহার বিফলতা, তাহার পরেই আগষ্ট আন্দোলন ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের ভয়াবহ ঝড়, এবং সর্বশেষ দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর মহামারী ; বাংলা দেশের কোটি খানেক নিরীহ মজুর-শ্রেণীর লোক একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

মন্ত্রী-মিশনের সঙ্গে এবারও সেই মহামান্য ক্রিপ্‌স দৌত্যে আসিয়াছিলেন, তিনি বা তাঁহারা যে সফল হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন তাহাও বলা যায় না, আগষ্ট আন্দোলন হয়তো ভ্রূণাবস্থায় পরিণতির অপেক্ষায় আছে, বামপন্থী জয়প্রকাশ-অরুণা আসফআলির দল নিশ্চয় নিশ্চেষ্ট নাই। ইতিহাসের পুনরাবর্তনে মানুষ অপেক্ষা করিতে পারিতেছে হয়তো, কিন্তু প্রকৃতি নিশ্চিন্ত নাই। তিনি ইতিমধ্যেই প্রবল ধাক্কা মারিয়াছেন উত্তর-পূর্ব আসাম ও দক্ষিণপূর্ব বঙ্গদেশে। 'সি' গ্রুপের পূর্বপ্রত্যন্ত-দেশ এমন প্রচণ্ড আঘাত খাইয়াছে যে, টাল সামলাইতে সামলাইতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পুনরাবর্তন অবশ্যম্ভাবী। লীগের শাসন প্রায় অব্যাহত আছে, চোরাবাজার বাড়িয়াছে বই কমে নাই। শ্বেতচামড়ার শাসক-সম্প্রদায় ভোটাধিকার বর্জন করিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়াছেন, মনে মনে নিশ্চয়ই বলিতেছেন, তোমাদের তাল তোমরা সামলাও বাপু। ইহাই এখন একমাত্র সংবাদ। বৈদেশিক সাদা-কাগজের অভাবের তাড়নায় সংবাদপত্রগুলি সম্ভবত অন্যমনস্ক আছেন, তাই আর্তনাদ শুনা যাইতেছে না।

আমরা কিন্তু দুর্গত আতুরদের দূরাগত ক্রন্দন-কোলাহল শুনিতে পাইতেছি—ভৈরবরভসে ঐ আসে ঐ আসে ঐ আসে ; সেবারে বস্ত্রাভাব ছিল না, এবারে অন্নাভাবের সঙ্গে বস্ত্রাভাব বিজড়িত হইয়া মন্বন্তর আরও বীভৎস হইবার কথা। তাহার উপর ডাক-ধর্মঘট আসিয়া জুটিয়াছে, রেলধর্মঘট হইতেই বা বাধা কি ! অ্যাপক্যালিপসে বর্ণিত চার ঘোড়সোয়ার প্রস্তুত, লাগাম শুধু টানিয়া ধরা আছে, মুহুর্মুহু ক্ষুরাহত হইয়া ধরণীর ধূলি আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সফেন মুখে হ্রেষাধ্বনিও কান পাতিলে শুনা যাইবে।

কংগ্রেসের দায়িত্ব এবারে অসাধারণ, ভাবিতেও ভয় হইতেছে। সেবারে কংগ্রেস রাজরোষে নিপতিত হইয়া বাতিল হইয়াছিল, নেতারা সকলেই কারাগারের নিরুপদ্রব ব্যবধান হইতে দেশের সর্বনাশ পরোক্ষে অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিশ্চেষ্ট সহানুভূতি খুবই বেদনাদায়ক হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু এবারে তাঁহাদের প্রত্যক্ষে মুমূর্ষু জীবনের সহিত প্রবল মৃত্যুর সংঘাত ঘটিবে। তাঁহাদের দায়িত্ব অপরিসীম। সেবারে আমরা তাঁহাদের অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির সুযোগে বহুবিধ সাফাই গাহিয়াছিলাম, এবারে সে সুযোগ নাই। আসন্ন আত্মজন-হত্যার গুরুতর পাপভাগী হইবার পূর্বেই তাঁহাদিগকে বিচক্ষণ সেনাপতির মত দুর্বলতার সকল ঘাঁটিই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে—সরকারী বাধা তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন, সরকারী সাহায্য তাঁহারা গ্রহণ করিবেন, সাম্প্রদায়িক বাধার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত থাকিবেন, দেশকে বাঁচাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে দেশকে শাসন করিবার অধিকারও এখন হইতে তাঁহাদিগকেই লইতে হইবে। দলগত স্বার্থবুদ্ধি জাগ্রত হইলে সে কর্তব্য তাঁহারা পালন করিতে পারিবেন না। বর্তমান

রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওহরলাল কারাগার হইতে বাহির হইয়া অবধি ময়ন্তর-মৃত্যু রোধ করিবার জন্য দেশের লোকের কাছে বাগ্‌বদ্ধ হইয়াছেন, বাংলা দেশের কংগ্রেসীরা দলাদলি করিয়া অথবা কালোবাজারী স্বার্থবুদ্ধি ধরিয়া রাষ্ট্রপতির সম্মানকে ক্ষুণ্ণ না করেন। আগে হইতেই আমরা সাবধান করিতেছি।

—

খেলার মাঠের লড়কে লেঙ্গে-পাকিস্তানী মনোবৃত্তি সাহিত্যেও কি ভাবে সঞ্চারিত হইতেছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত গত আষাঢ়-সংখ্যা মাসিক 'মোহাম্মদী'র প্রথম পৃষ্ঠায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি নজরুল ইসলাম স্বয়ং সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে যাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দু-মুসলমান সকল বাঙালীর প্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার গুলিগোলা হিসাবে তাঁহাকেই ব্যবহার করা হইবে জানিলে তিনি অসুস্থ না হইয়া মরিয়া বাঁচিতেন। "রেণেসাঁর কবি নজরুল" প্রবন্ধের লেখক মোহাম্মদ মোদাব্বের হিন্দুকবি রবীন্দ্রনাথকে ঘায়েল করিবার জন্য মুসলমান কবি নজরুল ইসলামের সহিত একটি তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। যথা—

"বাংলার গত দুই শতাব্দীর জীবনে এমনি দু'জন যুগ-স্রষ্টার আবির্ভাব ঘটেছে···

একজন সমৃদ্ধ-বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ।

অপরজন দুস্থ বেদনাহত বাংলার কবি নজরুল ইসলাম।

অনুকূল পারিপার্শ্বিকতার মাঝে মুখে রূপার-চামচ নিয়ে জন্ম হয় রবীন্দ্রনাথের। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বিকাশের পথ ছিল কুসুমাস্তৃত।

প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার মাঝে—দুঃখ ও দৈন্যের দুর্ব্বহ বোঝা মাথায় নিয়ে জন্ম নিলেন নজরুল ইসলাম। তাঁর যাত্রাপথ কণ্টকাকীর্ণ। পায়ে তাঁর বাধা-নিষেধের শৃঙ্খল। তাঁর চলার পথের বাঁকে বাঁকে হিংস্রতার ভয়াল ইঙ্গিত।

প্রতিভার উল্কাপিণ্ড নজরুল···

নজরুলকে কেন্দ্র করেই বাংলার সাহিত্য-জগতে হল রেনেসাঁর সূচনা। তাই নজরুল ইসলামকে বলতে হয় রেনেসাঁর কবি, শতাব্দীর কালজয়ী প্রতিভা।"

—

বঙ্কিমচন্দ্রকে বহুজনে বহুবিধ অপবাদ দিয়াছেন, সিরাজ-প্রশস্তির অছিলায় তাঁহাকে মিরজাফর উপাধি বাংলাদেশে পাকিস্তান-সূচনার সর্বপ্রথম দান। বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেবের খাস 'মিল্লাতে' (২০ আষাঢ়, ৫ জুলাইয়ের সংখ্যা) এই উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসের কোনও নায়কের একটি মিসকোটেড্ উক্তি—"আমরা রাজত্ব চাই না, ইংরেজ রাজত্ব করবে, তাতে আমাদের আপত্তি নেই" 'মিল্লাতে'র ১ম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে মিরজাফর টাইটেল দেওয়া হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা ভাল কোটেশন আমরা দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই।

আমাদের প্রশ্ন এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির সব চরিত্রের উক্তিই কি বঙ্কিমের উক্তি? শেক্সপীয়রের নাটকগুলির সব চরিত্রই কি শেক্সপীয়র? এই হইল বিরুদ্ধ যুক্তি, কিন্তু আসলে বঙ্কিমের রচনা হইতে উদ্ধৃতিটিই যে বিকৃত ও মিথ্যা, তাহার পাপ কাহাতে বর্ত্তাইবে? সুরাবর্দি সাহেবকে কি? দেশে ন্যায় ও সত্যের শাসন থাকিলে 'মিল্লাতে'র ধাড়িবাচ্চা সকলকেই এই ঘোরতর মিথ্যাচরণের জন্য শাস্তি পাইতে হইত। কিন্তু হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর শ্যালকের কান মলিবে কে? পাকিস্তানের নামে যে কি পরিমাণ জুয়াচুরি স্বয়ং বাংলার প্রধানমন্ত্রী মারফৎ চলিতেছে, তাহা সর্বসাধারণের কাছে বিশদভাবে প্রকট করিবার জন্য আমরা 'মিল্লাতে'র উদ্ধৃতি ও বঙ্কিমচন্দ্রের আসল লেখা পাশাপাশি তুলিয়া দিতেছি।

'মিল্লাত'—"এই [মিরজাফরী] মনোবৃত্তিই একদিন বঙ্কিমের কলমের মারফৎ বলেছিল—'আমরা রাজত্ব চাই না। ইংরেজ রাজত্ব করবে, তাতে আমাদের আপত্তি নাই; আমরা চাই নীচ যবনের ধ্বংস।' এই মনোবৃত্তিই প্রকট হয়েছিল মুসলিম রাজত্ব অবসানের সময় এবং তার পরে যখন ইংরেজদের সাথে রাজ্যশাসনে এদেশের এক শ্রেণীর লোক সহযোগিতা করলো।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', ৩য় খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ—"চতুর ভবানন্দ যখন দেখিলেন, ইংরেজের তোপ সকলই গেল, সৈন্য সব গেল, যাহা অল্পই রহিল, তাহা সহজেই বধ্য, তখন তিনি নিজ হতাবশিষ্ট দলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, 'এই কয়েকজনকে নিহত করিয়া জীবানন্দের সাহায্যে আমাকে যাইতে হইবে। আর একবার তোমরা জয় জগদীশ হরে বল।' তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তান-সেনা 'জয় জগদীশ হরে' বলিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন টমাসের উপর লাফাইয়া পড়িল। সে আক্রমণের উগ্রতা অল্পসংখ্যক সিপাহী—তৈলেঙ্গীর দল সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিনষ্ট হইল। ভবানন্দ তখন নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিলেন। কাপ্তেন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, 'কাপ্তেন সাহেব! তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস, তোমার প্রাণদান দিলাম। আপাততঃ তুমি বন্দী। ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।"

এই ভয়াবহ ডবল মিথ্যাচারের প্রতিকার বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেব করিবেন কি?

—

বর্তমান সংখ্যা (১৩৫২, পৌষ) 'চতুরঙ্গে' "আড়াল" নামক একটি গল্পে শ্রীরমাপদ চৌধুরী আধুনিক কলেজে শিক্ষিতা মেয়েদের একেবারে বে-আব্রু করিয়া ছাড়িয়াছেন। সুজাতার বাড়িতে তাহার কলেজ-বন্ধু ইন্দ্রানী বেড়াইতে আসিয়াছে। উভয়েই কুমারী,

কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে খবর পাওয়া গেল, সহপাঠী সুকুমারের সঙ্গে ইন্দ্রানীর একটা অ্যাফেয়ার হইয়াছিল, এবং সুকুমার কি একটা কুৎসিত ব্যবহার করাতে ইন্দ্রানীর পক্ষে দুঃখকর ছাড়াছাড়িও হইয়াছিল। আরও খবর পাওয়া গেল যে, থ্রি মাসকেটিয়ার্স নামে খ্যাত তিন সখীর অন্যতমা অশোকা কোন এক ষ্টেটে গবর্নেসের চাকুরি লইয়া গিয়াছে।

"—গভর্নেস? তাই বলেই অবশ্য নিয়ে যায়। বিষণ্ণ ছায়া পড়লো ইন্দ্রাণীর মুখে।"

আরও অনেক খবর।

"ওদের সেই কোডের ভাষার কথাকওয়া, পুরুষ সতীর্থদের গোপন নাম, প্রফেসরদের দুর্বলতা। ডক্টর সেনের সঙ্গে মঞ্জুশ্রীর নাম জড়িয়ে রটনা করা।···কার্শিভালের রাতটা মনে পড়ে। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল বাড়ি ফিরতে। বকুনি খেয়েছিল খুব একচোট। মিথ্যার প্রহসন বুনতে বুনতে বাসায় ফিরেছিল, কাজে লাগেনি।···আর একদিন। মেট্রোয় কি একটা সিনেমা দেখতে গেছে তারা ম্যাটিনিতে। পিছনের রোয়ে বসেছিল কলেজেরই একদল ছেলে। দুপক্ষই হাসাহাসি করেছিল। ঠাট্টা, বিদ্রূপ। সম্মুখে যুদ্ধ নয়। ইন্দ্রানীরা শুনিয়ে শুনিয়ে ব্যঙ্গবাণ ছুঁড়েছিল পশ্চাদ্বর্তীদের উদ্দেশ্যে। তারাও। আড়চোখে পিছন ফিরে তাকানো, আর ঠোঁট টিপে টিপে হাসা।"

সংবাদ আরও আছে।

"—বিয়ে করে ফেল শীগগির। সুজাতা বললে মৃদু হেসে।—যৌবন তো শেষ হতে চললো।

—বিয়ের সখ আমার ঐখানেই মিটে গেছে। বুঝেছি সব পুরুষই ওই সুকুমারের মত।"

ইন্দ্রাণী চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "বাঁ হাতের মণিবন্ধে ঘড়িটা বাঁধতে বাঁধতে সময়টা দেখে নিলে সুজাতা। না তার আসবার সময় হয়নি এখনো।" "চুলটা আর একবার ভালো করে আঁচড়ে নিয়ে কবরী বাঁধলে সুজাতা। নিপুণ হাতে। ব্রিলেন্টাইনের প্রলেপ দিলে চুলে। মুক্তোর মালাটা কড়ে আঙুলে জড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালে।

দু'সেট দুল্ হাতে করে ভাবলে কিছুক্ষণ। প্ল্যাটিনামের দুলটা পরাই ভালো। দয়িতাকে উপহার দিয়ে প্রত্যেক প্রেমিকই খুশী হয়। প্রণয়ীর দেহে সেই উপহারের ঔজ্জ্বল্য দেখে সুখী হয় আরো বেশী। নিপাট সাদা জর্জেটখানা পেঁচিয়ে পরলে সে। ডান হাতে পরলে আট গাছা সরু সরু রঙিন কাঁচের জলচুড়ি। বাঁ হাতের ষ্ট্র্যাপটা বদলে নিলে। সাদা ভেলভেটের ফিতেটাই ম্যাচ করবে। মুঠো মুঠো পাউডার ঢেলে দিলে বুকের ভাঁজে। কাঁধে, পিঠে, মুখে মাখলে গোলাপী সুবাস-রেণু। রঙের লালিমায় অধর রাঙালে। ইভনিং-ইন-প্যারিসের স্প্রে দিল বেসবাসে। আয়নায় চোখ রেখে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলে সে নিজেই মোহিত হয়ে গেল নিজের রূপে। নীল রেশমী স্কার্ফটা রিফ্ নট দিয়ে ফাঁসিয়ে নিলে। আবার খুললে সেটা বাঁ হাতে বাঁধলে স্কার্ফটা ঘড়িটা ঢেকে।

তারপর ধীরে ধীরে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালে সে অপেক্ষমানা অভিসারিকার মত। পথের দিকে তাকিয়ে রইলো অধীর উদ্বেগে। আসবে তো।

হর্ণ বাজলো সচকিত হয়ে উঠলো সুজাতা। স্পষ্ট হয়ে উঠলো ছোট লাল রঙের টু-সীটারখানা! ও আসছে!

গাড়ীটা বাড়ীর সামনে ঘন ঘন হর্ণ বাজিয়ে দূরের গ্যাসপোষ্টের নীচে গিয়ে দাঁড়ালো। ওপরের হুডটা খোলা। গ্যাসের আলো পড়েছে ওর মুখে। চিকচিক করছে চশমার ফ্রেমটা। ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে তাকালে সে সুজাতার ঘরের দিকে। সুজাতা পেছিয়ে এল। মুখের ও দেহের ওপর আলোটা পড়েছে কি না দেখে নিয়ে হাত নেড়ে অপেক্ষা করতে বললে।

তারপর উঁচু হিল্ জুতোটা হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেল।"

• • •

শুধু এই গল্পই নয়, জ্যৈষ্ঠের 'পূর্বাশা'য় শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অমানুষিক" গল্পেও দেখিতেছি দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের তাড়নায় এক অতি দরিদ্র দম্পতির, ছিদাম আর কুজার বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। গেল তৈজসপত্র, গেল গাই'টা, গেল কুজার রূপার পৈছা, কানের মাকড়ি, শেষ পর্যন্ত ভিটেটাও বাঁধা পড়িল ললিতবাবুর কাছে। ছিদাম পলাইয়া বাঁচিল, ভিখারী হইল, ডাকাত হইল, "সরকারী মেয়ে-বস্তির উচ্ছিষ্ট মেয়ে গাবো"কে লইয়া রোজগারের চেষ্টা করিল এবং শেষ পর্যন্ত একদিন সেই বাঁধাপড়া ভিটের টানে দেশে আসিল। কুজাকে দেখিল।

"চেহারা ফিরেছে কুজার। আজ মেঘলা অবেলায় খাসা দেখাচ্ছে কুজাকে। এ বড় অদ্ভুত কাণ্ড নয় কি! বিয়ের সময়কার রোগা প্যাঁটকা মেয়েটা ছ'সাত বছর যদ্দিন স্বামীর সঙ্গে ঘরকন্না করল, একটা ছেলে আর মেয়ের মা হয়েও রইল যেন প্যাকাটি, স্বামীর দেড় বছরের অন্তর্দ্ধানের সময়টাতে সে মরার বদলে পুড়ন্ত বাড়ন্ত যুবতী হয়ে গেছে!

কুজা ঝেঁঝে বলে, বাড়ন্ত সব, আরেক বাড়ি যাও।

ছিদাম বলে, চিনলা না মোরে? আমি যে ফির‍্যা আলাম।

কুজা দু'পা এগিয়ে যায়। তুমি! ফির‍্যা আসছ? কন খেইকা আইলা তুমি?

ম্রিয়মান ছিদাম বেড়া পেরিয়ে কাছে এগিয়ে আসে, উদাসকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, যামু গা?

ক্যান? যাইবা ক্যান? বসবা একদণ্ড? জলডা নিয়া আসুম?

গুম খেয়ে ছিদাম বসে থাকে। তার ঘরে খাট, টেবিল, তাক দেখে আর সে সমস্তে শহুরে-শয্যা, জিনিসপত্র, প্রসাধন-সামগ্রী দেখে, ললিতবাবুর বুড়ী ঝি সুবালার মাকে

উঠান ঝাঁট দিতে দেখে, রসুই ঘরের নতুন ক'রে গড়া চালার নীচে কোন একজন রাঁধুনী রান্না চাপিয়েছে টের পেয়ে, গোয়ালে দুটো প্রকাণ্ড পশ্চিমা গাই দেখে, হিমসিম খেয়ে গেছে ছিদাম। ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফিরে তাকে এখানে বসে থাকতে দেখে কুজা একটু রাগ করে।

আসো, আসো, আসো—ভিতরে আসো।

কুজা তাকে একরকম জোর করেই ভিতরে নিয়ে গিয়ে খাটে বসিয়ে দেয়, খাটে ছিদাম বসে তার জীবনে এই প্রথম, দামী খাটে গদি, তাতে তোষক, তাতে আবার চাদর পাতা ধবধবে পরিষ্কার।

তামাক দিবার পার একছিলুম?

কুজা তাক থেকে টিন সামনে ধরে সিগারেটের।

যামু?

ক্যান যাইবা? বস।

বাইরে থেকে ঘা পড়ে সামনের দরজায়।

কেডা? কুজা শুধায়।

আমি। জবাব আসে পুরুষের গলায়।

ছিদাম ফিস ফিস করে কুজাকে শুধায়, ললিতবাবু নাকি?

কুজা মাথা নামিয়ে সায় দেয়।

কি করণ যায় অখন!

কি জানি।

আবার ধাক্কা পড়ে দরজায়।

খুলে দে। ছিদাম শেষে বলে নিজে থেকেই। উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরের দরজা দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।"

• • •

গল্পগুলির রচনা-নৈপুণ্য অথবা শৈথিল্য আমাদের বিচার্য নয়, কোন্ বিষয়বস্তু লইয়া এ যুগের কথা-সাহিত্যিকেরা কারবার করিতেছেন তাহাই বিচারের বিষয়। জ্যৈষ্ঠের 'মাসিক বসুমতী'তে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ "রাহু" গল্পে, শ্রীআশীষকুমার বর্মণ "কার কপাল আর ফাটে কার" গল্পে, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা (১৩৫২) 'গুলিস্তাঁ'য় শ্রীমতী ইন্দিরা গুপ্ত "তুমি নি আমার বন্ধু" গল্পে, জ্যৈষ্ঠের 'পরিচয়ে' শ্রীননী ভৌমিকের "একতলা" গল্পে একই সামাজিক ব্যাধির বিভিন্ন প্রকাশ দেখিতেছি—কোথায় যেন কি একটা কল বিগড়াইয়া গিয়াছে, অচল হইবার অবস্থা। বাড়ির সমর্থ চাকরের সেক্সহাঙ্গার এবং তাহা যথাকালে পরিতৃপ্ত হইতে না দিবার ফলে তাহার কুৎসিত ব্যাধি, সরকারী চিকিৎসায় তাহার নিরাময়,

মনিবের সহানুভূতি, তাহাকে নিয়মিত দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা এবং সেখান হইতেও ব্যাধি লইয়া প্রত্যাবর্তন, কারণ

"মধু মাথা নীচু করল, তারপর অনেক সংকোচে ধীরে ধীরে বলল···গণেশের মা [অর্থাৎ মধুর স্ত্রী]···ওখেনেও মিলিটারিরা এসেছিল।"

ইহাই হইল শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের "রাহু"। শ্রীমতী ইন্দিরা গুপ্ত দেখাইয়াছেন, কাব্যপ্রবণ স্ত্রী গীতির ম্যাটার-অব-ফ্যাক্ট স্বামী মন্মথর হাতে পড়িয়া মানসিক ক্লেশ, মন্মথর বন্ধু রণজিতের আবির্ভাব, তাহার সহিত গীতির ঘনিষ্ঠতা এবং শেষ পর্যন্ত বাড়ির পাশে মহুয়াবনে বেড়াইতে গিয়া রণজিতের অধীরতা দর্শনে

"আর্তস্বরে গীতি বলে, না! না গো না। চাই না আমি প্রিয়া হতে—চাই না হতে প্রেয়সী। পরস্পরের দেহ নিয়ে কামড়াকামড়ি করা, যেমন কুকুরে এক টুকরো মাংস পেলে করে—তেমন প্রিয়াত্বে আমার রুচি নেই। পৃথিবীর আদিকাল থেকে এই যে ক্রমোবর্তিত গতানুগতিক ইতিহাসের ধারা, কোনও কালেই কি এর কিছুমাত্র পরিবর্তন হবে না? পঙ্কিল কামনা কলঙ্কিত আত্মতৃপ্তির মধ্যেই কি মানুষের জৈব-লীলার শেষ কথা নিহিত রয়েছে!

উত্তেজিত হয়ে উঠে রণজিৎ বলে, মনের মিলনের পর দেহের মিলন, এই ত ভালবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—বাধা দিয়ে গীতি বলে, রক্ষা কর, তবে আমার ভালবাসায় কাজ নেই।"

• • • •

আধুনিক সভ্যতার বিকৃতি আমাদের সমাজ ও সাহিত্যে যে বিষময় ফল ফলাইতেছে, সে বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। শুধু এ দেশে নয়, পাশ্চাত্য সমাজ ও সাহিত্যেও এই ভাঙন দেখা দিয়াছে এবং সেখানকার মনীষীরাও চিন্তা করিতেছেন। আমেরিকার একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত এই প্রসঙ্গে নিরাশা-বাদীদের (possimists) সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিলেই আমরা বুঝিব, এই ব্যাধি সমস্ত বিশ্বকে আক্রমণ করিয়াছে। তিনি আধুনিক সমস্যার সকল দিক দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আগামীবারের জন্য মুলতুবি রাখিয়া আমরা তাঁহার কথা কিছু উদ্ধৃত করিয়া এবারকার প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। তিনি বলিতেছেন—

You have grown up in a generation that has experienced, or remembers, war; and this has changed everything for you. You have seen violence let loose in a hundred forms, and new devices of international murder invented with great care; you have seen the crude realities of imperialistic greed and commercial competition behind the suave surface of diplomatic notes, and you cannot believe in Utopias any more. Your magazines specialize in showing you the worthless phases of modern life; they consume themselves

in attacking abuses and ignorance, in describing injustices and stupidity : they have declared war on all sentimentality and tenderness, and with laughter and statistics they whip you into a stoic apathy that has no belief in any goodness, and no trust in any love.

I pity you for the plays that you see, the pictures that you bear with, the music that you hear, and the liquor that you have to drink ; they have all been poisoned by democracy and war. For the war hastened the industrialization of women, and flung them into such perpetual intimacy with men as was bound to break through the dykes that the old moral code had built to control the flood of sex in a world where puberty no longer brings marriage. The war unbalanced the minds of men and spread throughout Europe and America [কলিকাতাতেও] that disease called modern painting, which had begun in a France exhausted and humiliated by defeat. And democracy, which we thought would lift all men to manhood, all women to intelligence, and all governments to nobility and peace—democracy has canceled the exceptional man, made thinking illegal, dragged down the best to the level of the most, and substituted, for the standards of the mature, the art and drama and music of the mob. There are two hundred theatres in New York, and not three plays which an adult mind would care to see : take away *Strange Interlude*, *Faust*, and perhaps one more, and the rest is degrading trash. The musical comedies that form so large a part of your education are merely burlesque for the bourgeoisie ; their humor is composed of horse-play such as was once confined to the rear rooms of saloons ; and their glorifications of the naked American girl lack all excuse of beauty. Buy a front seat at these monstrosities, and lose another delusion.

উপরে উল্লিখিত যাবতীয় বীভৎসতা আমাদের দেশেও দেখা দিয়াছে, সুতরাং এবিষয়ে সকলের তৎপরতা প্রয়োজন।

—

"শব্দের অপপ্রয়োগ" সম্পর্কে প্রায় তিন ডজন আলোচনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, অনেকগুলির মধ্যে কাজের কথা আছে। ভাদ্র সংখ্যায় এই সকল আলোচনার প্রয়োজনীয় অংশ একটি প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইবে।

—

এবারেও স্থানাভাবে পুস্তক-পরিচয় দেওয়া গেল না। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় যাবতীয় হস্তগত পুস্তকের উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।